হিন্দু-সমাজের সমস্যা।

প্রথম খণ্ড।

আমিত্বের প্রসার" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, "হিন্দু-পত্রিকা"-
সম্পাদক, কলিকাতা—হাইকোর্টের উকীল এবং
যশোহর-ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান্, বেদান্ত-
বাচস্পতি, বিদ্যাবারিধি, কৈশরি-ই-
হিন্দ রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত—

রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাদুর
এম্, এ, বি, এল্, প্রণীত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিন্দুপত্রিকা
কার্য্যালয় যশোহর হইতে প্রকাশিত।

১৩২৫।

মূল্য ॥০ আট আনা।

হিন্দুসমাজের সমস্যা।

(প্রথম প্রবন্ধ)

ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ বহুদিন হইতেই দুর্দৈবের ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে মহামূর্চ্ছার ক্রোড়ে শায়িত। সাড়া শব্দ নাই ; সমস্ত অঙ্গে স্তব্ধতার আধিপত্য। আপাততঃ বোধ হয় মৃত্যু ইহাকে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিলে, ইহার হৃৎপিণ্ডে প্রাণ-স্পন্দনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক কৃতীপুরুষ সেই স্পন্দনের ছন্দ অনুসরণ করিয়া "মৃত্যু নহে, মূর্চ্ছা" স্থির করিয়া, ইহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা সম্যক্ ফলপ্রসূ হয় নাই ; তবে প্রচুর চেষ্টার ফলে ইহা ক্ষণকালের জন্য চক্ষুরুন্মীলন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পরক্ষণেই মূর্চ্ছার—গাঢ়নিদ্রার ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। মূর্চ্ছাভঙ্গ ঘটে নাই—ঘুমের ঘোর কাটে নাই।

ইংরাজরাজত্ব-সময়েও ভারতবর্ষকে—বিশেষভাবে হিন্দু-সমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকা-

নন্দ, তত্ত্ববিদ্যাসমিতির (Theosophical society) নেতৃবর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষকে—ভারতীয় হিন্দুসমাজকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যভাবে ইহার প্রতিক্রিয়ারও আয়োজন প্রচুর হইয়াছে। এক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত জাগরণ-চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'না না—জাগিয়া কাজ নাই। এমন সুখসুষুপ্তি ভাঙ্গিও না। বেশ আছে, এইভাবে থাকিতে দেও।" এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, অনুকূল-প্রতি-কুল-চেষ্টার সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়া, জাগরণচেষ্টাই বিশেষভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। রাজনীতির দিক্ দিয়াও ভারতকে জাগাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টার কেন্দ্রস্থান জাতীয় মহাসমিতি বা National congress. ভিতর হইতে জাগাইবার চেষ্টা এই দুইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের জাগরণের অনুকূল ব্যাপার বাহির হইতেও প্রকাশ পাইয়াছে। সুদূর দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়রযুদ্ধে, রুস-জাপযুদ্ধে, চীনযুদ্ধে এবং চীনের প্রজাতন্ত্রপ্রবৃত্তির তোপধ্বনিতে ভারতবর্ষ ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মেলিয়া আবার ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ বিশ্ববিক্ষোভকর ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের শ্রবণবিদারক তোপধ্বনি ভারতের কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অন্যরূপ প্রচেষ্টার ফলে ভারত যেরূপ ক্ষণিক ক্ষীণ-সংজ্ঞালাভ করিয়াছিল, এবার তদপেক্ষা অধিক স্পষ্ট প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও ভারত পূর্ণরূপে সুপ্তি হইতে মুক্ত হয় নাই, কিন্তু এই নবজাগরণের সূচনায় স্তিমিতভাব, অবসাদ ক্রমে

কমিতেছে। তমোময়ী রজনীর অবসানে তরুণ অরুণরাগে দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতের হিন্দুসমাজদেহে যে পরিমাণ জাগরণের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে, তদপেক্ষা মুসলমান-সমাজদেহে উহা অধিকমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে—ইহা উভয়-সমাজদেহের অঙ্গচালন-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যাইতেছে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলে, ইহার ভাগ্যগগনে পরে রক্তরবির আলোকপুলক আধিপত্য করিবে, কি মসীকৃষ্ণ মন্থরমেঘ দেখা দিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

মুসলমানসমাজকে জাগান সহজ, কিন্তু হিন্দুসমাজকে জাগান সুকঠিন। সমগ্র জগতের মুসলমান্‌সম্প্রদায় এক সুবিশাল মুসলমান্‌সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ইহাদের মধ্যে একই প্রাণ বিদ্যমান—সর্ব্বত্রই এক-প্রাণতার লীলাখেলা—একই বেদনার একই চেতনার অনুভব। একস্থানে একটী চিম্‌টী কাটিলে সমগ্র মুসলমান্‌সমাজদেহ সাড়া দেয়। হিন্দুসমাজেও পূর্ব্বে এই একপ্রাণতা ছিল। বেদের পুরুষসূক্তে সমাজস্থ সকল লোককে (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের জনসমূহকে) এক বিরাট্‌পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ বা উত্তমাঙ্গ, ক্ষত্রিয় বাহু বা বক্ষোদেশ, বৈশ্য উরু বা উদরদেশ, শূদ্র পদ বা নিম্নভাগরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায়, সমগ্র হিন্দুসমাজদেহ বৈদিকযুগে একটী ব্যক্তি-গত দেহের মত বিবেচিত হইত। উহার প্রত্যেক অঙ্গের বা

বর্ণের মধ্যে পরস্পর উপযোগিতা অনুসারে একপ্রাণতা ছিল। তখন সে সমাজের সর্ব্বত্র একই প্রাণের খেলা দেখা যাইত— সমগ্র সমাজদেহের সুখ দুঃখ একই অনুভবের বিষয় হইত। তখন হিন্দুসমাজ নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত ছিল না, সম্পূর্ণ জাগরিত ও সমুন্নত ছিল। এখন হিন্দুসমাজে সে ভাব, সে একদেহত্ববোধ— সেরূপ একপ্রাণতা নাই। এখন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রাণস্পন্দন চলিতেছে। এক অংশের সুখদুঃখবোধের সহিত অন্য অংশের সুখদুঃখবোধের সামঞ্জস্যও নাই, সম্বন্ধও নাই। কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ আর, একটী ব্যক্তিগত দেহের মত নাই। ইহা বহু বিভিন্ন-ভাবাপন্ন দেহের সামঞ্জস্যবিহীন কল্পিত-সমষ্টিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এখন পুরুষসূক্তের শিক্ষা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই বহুধা বিভিন্ন হিন্দুসমাজকে জাগাইতে হইলে, বহুস্থানে বোধশক্তি জাগাইতে হইবে। বহুস্থান প্রবুদ্ধ করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ভেদবোধ আছে, তাহা দূর করিতে হইবে এবং একত্ববোধের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একত্ববোধ চাই, নচেৎ একপ্রাণতা আসিবে কিরূপে? তুর্ক-মুসলমান্‌গণের দুর্গতিকে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের মুসলমানেরা নিজেদের দুর্গতি মনে করেন। বিশেষ কারণে ঐ দুর্গতির প্রতীকার করিতে তাঁহারা চেষ্টা করুন্ বা না করুন্, ঐ দুর্গতি দূর করিতে পারুন্ বা না পারুন্, কিন্তু ঐ দুর্গতি তাঁহারা প্রাণে অনুভব করেন, ইহা সত্য। ইহা মুসলমান্-সম্প্রদায়ের নিন্দার কথা নহে; ইহা সত্য কথা ও গৌরবের কথা।

সেদিন আরাজেলায় কতিপয় মুসলমানের উপর কতকগুলি হিন্দু কিছু অত্যাচার করায় সমগ্র ভারতের মুসলমান্‌সমাজ দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু ঐ সম্পর্কে যদি কোনও হিন্দুর উপর অন্যায় করা হইয়া থাকে, তবে কি সেজন্য সমগ্র হিন্দুসমাজে দুঃখের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব? বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বর্ত্তমানে একত্ববোধ নাই। হিন্দুসমাজে সার্ব্বজনীন একত্ববোধ ত নাইই, অধিকন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একত্ববোধও লোপ পাইতে চলিয়াছে। ধরুন—ব্রাহ্মণসমাজ, ইহার মধ্যে কত ভেদ! সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়ীয়, মৈথিল, মহারাষ্ট্রীয়, উৎকলীয়, মাথুর, মাগধ, দ্রাবিড় প্রভৃতি কত প্রাচীন ভেদ। অধুনাতনকালে এক বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, বর্ণকব্রাহ্মণ প্রভৃতিও মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী প্রভৃতি আরও বহুভেদ আছে। বৈদিক-সমাজে পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য ভেদ। আরও অনেক অবান্তরভেদ মস্তক উত্তোলন করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণসমাজের একপ্রাণতায় বাধা জন্মাইতেছে। শুধু বাঙ্গালায় নহে, বম্বে, পঞ্জাব, মাদ্রাজ, মধ্যদেশ, যুক্তপ্রদেশ সর্ব্বত্র এই এক ভাব—সর্ব্বত্রই ভেদবুদ্ধির রাজত্ব। ব্রাহ্মণসমাজে যে ভাব, ব্রাহ্মণেতর সমাজসমূহেও সেই ভাব। সর্ব্বত্রই একত্ববোধ লুপ্ত।

একত্ববোধ লুপ্ত হওয়াতেই ভারতের দুর্গতি হইয়াছে। যত-দিন ভারতে একত্ববোধ জাগরিত ছিল, একপ্রাণতা ছিল, ততদিন

ভারত জগতে গৌরবিত ছিল। আলেক্জাণ্ডার্, মহম্মদ ঘোরী, সুলতান্ মামুদ প্রভৃতির আক্রমণে যে ভারতবর্ষ দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত হইয়াছে, তাহার কারণ একত্ববোধের অভাব। ভারতে যদি সমস্ত সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা থাকিত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত আক্রমণকারিদের কাহারও ভাগ্যে সাফল্যের বরমাল্য-লাভ ঘটিত না, ইহা নিশ্চয়।

তর্ক হইতে পারে, বৈদিকযুগে যে বর্ণবিভাগ ছিল, তাহাও ত একত্ববোধের প্রতিকূল! আর যদি চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ থাকা সত্ত্বেও সমগ্র সমাজে কার্য্যকারী একত্ববোধ থাকিতে পারে, তবে বহুজাতিভেদ ও নানা-সম্প্রদায়-ভেদেই বা একত্ববোধ বিলুপ্ত হইবে কেন? প্রত্যুত্তরে বলিব—বৈদিক চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগের সীমাচিহ্ন কার্য্যতঃ অলঙ্ঘ্য ছিল না। তখন গুণকর্ম্ম অনুসারে উন্নয়ন অবনয়ন ছিল। শূদ্র যে চিরদিন (ব্রাহ্মণোচিত-গুণকর্ম্ম-সম্পন্ন হইলেও) শূদ্রই থাকিবে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না—এরূপ সঙ্কীর্ণতা তখন হিন্দুসমাজে স্থান পাইত না। শূদ্র মনে করিত, "একদিন গুণকর্ম্মবলে আমি ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিব; চিরদিনই শূদ্র থাকিতে বাধ্য হইব না।" এই আশা তাহাকে ত্রিবর্ণ-সমাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিত। কৃষক যখন দেখিত, তাহার গুণবান্ জ্ঞানবান্ ভ্রাতা যজ্ঞকার্য্যে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার পাইয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয় ব্রাহ্মণসমাজকে আর 'পর' মনে করিতে পারিত না। কর্ম্মদোষে পতন ও কর্ম্মগুণে 'উত্থান, সে

সমাজে ছিল। (১) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের পুত্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার কর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয় বীতহব্য, (২) বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বৈশ্য নাভাগারিষ্টের পুত্রদ্বয় (৩) ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন, হীনশূদ্র কবষ ঋষিত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তখন এক মহর্ষি শুনকের বংশধরগণ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। (৪) যেখানে উন্নতির আশা ও অবনতির ভয় থাকে, সেখানে একলক্ষ্যে এক উদ্দেশ্যে সকলেই ধাবিত হইতে পারে। সেখানে কিছু পৃথগ্‌ভাব বা ভেদজ্ঞান থাকিলেও কার্য্যতঃ হানিকর হয় না। আজ আমেরিকার একজন শ্রমজীবী যেমন এই জীবনেই আমেরিকার দেশপতিত্ব বা প্রেসিডেণ্টপদ পাইবার আশা পোষণ করিতে পারে, সেইরূপ তখন শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব পাইবার আশা পোষণ করিত। ব্রাহ্মণকে শূদ্র "যোগ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা" বলিয়া মনে করিত, স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বস্তুতই মনে করিত না। কাজেই একপ্রাণতার বাধা ঘটিত না। যে সমাজের লোক ঐরূপ উচ্চাশা পোষণ করিতে পারে না, সে সমাজে জড়তা আসিয়াছে; তাহার মঙ্গলে সন্দিহান হইতে হয়। গুণবানের উচ্চাশার অধিকার ছিল বলিয়া সূতপুত্ররূপে পরিজ্ঞাত কর্ণও ক্ষত্রিয়োচিত মর্য্যাদা, রাজ্যসম্পদ্, ও ক্ষত্রিয়সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। পৌরুষপ্রকাশের অবকাশ ছিল বলিয়াই কর্ণ বলিতে পারিয়াছিলেন—

সূতো বা সূতপুত্রো বা যোবা কোবা ভবাম্যহম্, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।

শ্রীভাগবতে আছে—

(১) যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যন্তন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎতৈনেব বিনির্দ্দিশেৎ।

গৌতম বলেন—

বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।

মনু বলেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।

(২)—যথা রাজা বীতহব্যোমহাযশাঃ।
রাজর্ষিদুর্ল্লভং প্রাপ্তোব্রহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্।

(৩) নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
হরিবংশ (১১ অ ৬৫৮)

(৪) বিষ্ণুপুরাণ (৪ অংশ ৮ অধ্যায়ে)
ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।
হরিবংশ (২৯ অ ২০) আছে—
পুত্রোঘৃৎসমদস্যাপি শুনকোযস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
বায়ুপুরাণেও অবিকল এই শ্লোক আছে।

কর্ণ সূত বা সূতপুত্রই হউন্ কিম্বা যে কেহই হউন্ তাহাতে কিছু আসে যায় না। নির্দ্দিষ্টবংশে জন্মগ্রহণ দৈবাধীন, কিন্তু ঐহিক উন্নতির মূলীভূত পুরুষকার তাঁহার করায়ত্ত ছিল; কাজেই সেই পুরুষসিংহ পৌরুষবলে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বহুচারিণী দাসী জবালার পুত্র সত্যকাম যে সত্যনিষ্ঠ বলিয়া

ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহার মূলেও গুণের মর্য্যাদাই দেখা যায়। যতদিন সমাজে এইরূপ তিরস্কার-পুরস্কার-ব্যবস্থা থাকে, ততদিন সে সমাজে ভেদবুদ্ধির বিষবেগ প্রকাশ পায় না। যখন এই সত্যের অবমাননা আরব্ধ হয়, গুণের অনাদর উপস্থিত হয়, তখনই সে সমাজে বিপ্লবের ভাব জাগিয়া উঠে। ক্রমে সমাজের এক অংশের সহিত অপর অংশের সহানুভূতিসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়—সমাজের জীবনস্রোত রুদ্ধ ও বদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। এখন গুণকর্ম্মের পূজা নাই, উন্নয়ন অবনয়ন নাই, কাজেই স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়সমূহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্ব্বর্ণ থাকায় ক্ষতি হয় নাই যে কারণে, সে কারণ এখন লুপ্ত, সুতরাং একত্ববোধ না জাগিলে চারিজাতি বা চারিশত জাতি যাহাই হউক ফল সমানই। বৈদিকযুগে একত্ববোধ ছিল,—একভাষা, একভাব, একলক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য লইয়া চারিবর্ণ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেন। সেদিন সমাজদেহ একই ছিল, এখন বহুদেহের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

পার্থক্যজ্ঞান বা ভেদবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি দেহ হইতে খসিয়া পড়িতেছে। হিন্দু-সমাজের নেতৃবর্গের অবজ্ঞায় উপেক্ষায় যে সকল অংশ সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, মুসলমান্‌সম্প্রদায় ও খৃষ্টান-সম্প্রদায় তাহা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া স্ব স্ব সমাজদেহে সংযুক্ত করিয়া লইতেছেন। হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লোক কেবল যে খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় সমাজে গৃহীত হইতেছে, তাহা নহে, তাহারা

নিজ নিজ নাম ভাব প্রথা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন নামাদি গ্রহণ করিতেছে এবং নিজেদের হিন্দুজাতিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে হিন্দুসমাজের জনবল দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অন্য সমাজের তুলনায়, অনুপাতে হিন্দুসংখ্যা অধিকতরভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। একবার সেন্সাসে দেখা গেল, কোনও স্থানে হিন্দুর সংখ্যা জনসংখ্যার ২/৩ এবং মুসলমানের জনসংখ্যা ১/৩, কিন্তু পরবর্ত্তী সেন্সাসে দেখা গেল —কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে জনবলে নবীন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে,—সমগ্র জনসংখ্যার ২/৩ মুসলমান্ এবং ১/৩ হিন্দুতে দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গের বহুস্থানে এইরূপভাবে হিন্দুসংখ্যা কমিতেছে ও মুসলমান্ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমান্‌সম্প্রদায় আরব পারস্য বা তুরস্ক হইতে লোক আনাইয়া স্বসমাজের পুষ্টিসাধন করিতেছেন না। হিন্দুসমাজের পরিত্যক্ত লোক লইয়াই প্রধানতঃ তাঁহাদের পুষ্টি হইতেছে। মরণের হারও মুসলমান্‌সম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুসম্প্রদায়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। যেরূপ দ্রুতগতিতে হিন্দুর সংখ্যা-সম্পত্তি কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে ঘোরতর আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই সংখ্যাহ্রাস হিন্দুসমাজের কঠোর সমস্যা। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চাশা বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমে হিন্দুসমাজের বাহিরে যাইতেছেন। যদি এই অনিষ্টের প্রতীকার করা না যায়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের অস্তিত্বলোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। হিন্দুসমাজ কাহাদের লইয়া? উচ্চবর্ণের লোকসংখ্যা নিম্নশ্রেণীর তুলনায় নিতান্ত অল্প; সুতরাং মাত্র উচ্চবর্ণ লইয়া

থাকিলে হিন্দুসমাজ ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। "শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল" ও "ব্রাহ্মণসভা" প্রভৃতির নেতৃবর্গ ইহার প্রতীকারার্থে কি করিতেছেন, হিন্দুসাধারণ তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই বিপৎপাতের প্রতীকার করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য নয়? হিন্দুসমাজের এই ভীষণ ক্ষয়ব্যাধির নিদান কি, এবং উহার সমাধান-সাধনে বা অনিষ্ট-প্রশমনেই বা কর্ত্তব্য কি, বর্ত্তমানে ইহা প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

হিন্দুসমাজ এখন জীবন-মরণ-সমস্যার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। একদিকে নবজীবনের আলোকময় নন্দনকানন, অপরদিকে মরণের অন্ধকারময় নরককুণ্ড। একদিকে উত্থান—আনন্দ, অন্যদিকে অধঃপতন—ঘোর দুঃখ। একদিকে আশার তরুণ অরুণ, অপরদিকে বিষাদের মসীকৃষ্ণ মেঘ। কিরূপে যে হিন্দুসমাজের মরণসঙ্কট অপনীত হইবে, কিরূপে যে জীবনের সৌভাগ্য সন্নিহিত হইবে, তাহাই প্রধান সমস্যা। হিন্দুসমাজের কোনও সম্প্রদায়ের কোনও মনস্বী মানবই এই চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না। আগামী ভীষণ বিপদের দুশ্চিন্তার আতঙ্কে মানুষ যেমন নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারে না, পরন্তু ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠে, তদ্রূপ হিন্দুসমাজের

এই সম্ভাবিত সর্ব্বনাশের শঙ্কায় সমাজ-হিতৈষী চিন্তাশীল মানবের চিত্ত একান্ত ব্যাকুল না হইয়া পারে না।

শুধু হিন্দুসমাজের নহে, সমগ্র ভারতের সম্মুখেই এই ভয়াবহ সমস্যা সমুপস্থিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের জীবনমরণ-সমস্যা লইয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান্ খৃষ্টান্ পারশীক প্রভৃতি সকলেই চিন্তাক্রান্ত হইয়াছেন। সমগ্র ভারতের সমস্যায় ভারতবাসিমাত্রকেই ভাবিতে হইবে। হিন্দুসমাজের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে হিন্দুকেই ভাবিতে হইবে, প্রতীকারের পথ হিন্দুকেই খুঁজিতে হইবে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারত-বাসীরই বাঁচিতে হইবে। কোনও সম্প্রদায়ের মরণ বা ধ্বংস সংঘটিত হইলে, সমগ্রভারতের বা ভারতবাসীরই ক্ষতি, সুতরাং কিরূপে সমগ্রভারতের জনগণকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করা যায়, তাহাই সমগ্রভারতের সমস্যা। হিন্দুসমাজের সমস্যা এই যে, প্রত্যেক হিন্দু উচ্চ নীচ সকল সম্প্রদায়ের লোক যেরূপে জীবিত থাকিয়া সমগ্রভারতীয় জনসঙ্ঘের অক্ষুণ্ণতা অব্যাহত রাখিতে পারে, তাহার অনুসন্ধান ও অনুসরণ। সমগ্রভারতের গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের মরণ-নিবারণের উপায় চিন্তা করা যাইবে।

হিন্দুসমাজের মরণনিবারণের অনেকরূপ উপায় অনেকে উদ্ভাবন করেন। কেহ কেহ বলেন—অন্যদেশের অন্যধর্ম্মাবলম্বি-গণ যেরূপ প্রণালীতে তাঁহাদের সমাজ রক্ষা করিতেছেন, হিন্দু-সমাজও সেইরূপ উপায়েই আসন্ন মরণের প্রতীকার করিতে

পারেন। এমতে জাতিভেদই হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশের কারণ। জাতিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কেহই হিন্দুর সমাজগৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং হিন্দুসমাজের শূন্য স্থানগুলির পূরণ হয় না। জাতিভেদরূপ কৃত্রিম-বাধা দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতিস্রোত চিরতরে রুদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং এই অস্বাভাবিক বাধা দূর করিলেই হিন্দুসমাজ মরণসঙ্কট এড়াইতে পারিবে।

কেহ কেহ বলেন,—জাতিভেদের মূল উচ্চনীচ-ভেদ অভিজ্ঞ-অল্পজ্ঞভেদ। জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে, উচ্চনীচভেদ লোপ পাইবে, অভিজ্ঞ অল্পজ্ঞের আসন সমান হইবে, সুতরাং জাতিভেদের বিলোপসাধন সমাজের প্রসারবৃদ্ধির বা গতিশীলতার কারণ হইলেও স্থিতিশীলতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, কাজেই উহার দ্বারা প্রকারান্তরে সমাজস্থিতির বাধা ঘটিবে এবং বিপ্লবের প্রবল প্রকোপে সমাজশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িবে। অব্যাহত উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ জীবননদীর প্রবলতা ঘোষণা করে বটে, কিন্তু উহা কুলঘাতী হইয়া থাকে। প্রায়শই উহা দ্বারা প্রাচীন দৃঢ়মূল কূল-তরু উৎপাটিত হইয়া আবর্ত্তে আত্মদান করিতে বাধ্য হয় অতএব জাতিভেদ উঠাইতে গেলে সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট হইবে।

এই তর্কের প্রত্যুত্তরে জাতিভেদ-বিলোপকারিগণ বলেন উচ্চনীচভেদ চিরকাল আছে এবং থাকিবে। সকলেই সমাজে স্ব স্ব শক্তি-সামর্থ্যের অনুরূপ আসন লাভ করিবে। জাতিভে

উঠিয়া গেলে, সকলেই সমান আসন লাভ করিবে, ইহা অসম্ভব। জাতিভেদ বলপূর্ব্বক নীচকে চিরদিনই নীচ থাকিতে বাধ্য করে, উচ্চে যাইতে দেয় না। নীচজাতীয় লোক যে উচ্চ-অধিকারের অনুকূল যোগ্যতা লাভ করিয়াও উচ্চজাতিতে স্থান পায় না, এই অনুচিত ব্যবহারের প্রতিকার করিতে হইলে, জাতিভেদের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিতে হইবে। সকলকে জাতিবন্ধন হইতে মুক্তি দিলে, তাহারা স্বীয় স্বীয় দায়িত্বজ্ঞান লইয়া, আত্মোন্নতির অনুকূল-মার্গে ধাবমান হইতে পারিবে। যাহার যেরূপ সাধনা, সে সমাজে সেইরূপ স্থান পাইবে, কেহ অনুচিত অধিকারের দাবী করিবে না। জাতিভেদ থাকাতেই যোগ্যতাহীন জন্মমাত্র-সম্বল লোকেরা উচ্চাধিকার লাভ করিয়া সমাজের ক্ষতি করিবার সুযোগ পাইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতীকার-পন্থা জাতিভেদের বিলোপ-সাধন। যোগ্যতা অনুসারে সমাজে উচ্চনীচ-স্থান-লাভ সকল দেশের সকল সমাজেই আছে। হিন্দুসমাজে যথার্থ যোগ্যতার আদর নাই। জাতিনামক কল্পিত বস্তুকে যোগ্যতার একমাত্র নিদানরূপে গ্রহণ করায়ই হিন্দু-সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। যে কুলতরু নদীর প্রবাহকে পঙ্কিল করে, তাহার উৎপাটন অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজকে বাঁচাইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী একটু পরি-

বর্ত্তিত আকারে এই মত প্রচার করিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ একেবারে জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে চাহেন নাই, তবে বর্ত্তমানে যেভাবে এই জাতিভেদ প্রচলিত আছে, এভাবে ইহাকে রাখা সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীন-ভারতীয় প্রথানুসারে গুণকর্ম্মানুসারী জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হওয়াই সঙ্গত ও কল্যাণকর। বর্ত্তমান জাতিভেদ অযৌক্তিক ও অশাস্ত্র।

এই উভয়মতের পার্থক্য কোথায়, তাহা চিন্তা করিতে গেলে বলা যায়—জাতিভেদ-বিলোপকারীরা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি-নামও উঠাইয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা হিন্দুসমাজরূপ সৌধকে বুনিয়াদ্ হইতে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন। হিন্দুনামে পরিচয় না দিয়া রাজা রামমোহন 'ব্রাহ্ম'নামে পরিচয় দিতে বলিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ 'হিন্দু' নাম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং আর্য্যনামে পরিচয় দিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যনাম গ্রহণ করায় নূতন পরিবর্ত্তন করা হয় না—ভ্রমের সংশোধন করা হয় মাত্র। প্রাচীন-শাস্ত্রে হিন্দুনাম নাই। ভারতীয়গণ "আর্য্য" নামেই চিরদিন পরিচিত আত্মজ্ঞানের অভাবেই আর্য্যসন্তানগণ পরপ্রদত্ত 'হিন্দু' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুনাম আর্য্যসন্তানগণের নিজস্ব নহে। পরপ্রদত্ত নাম ত্যাগ করিয়া বেদপ্রসিদ্ধ নিজস্ব আর্য্যনামেই আর্য্যসন্তান-গণের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। গুণকর্ম্মানুসারে উন্নয়ন অবনয়ন চলুক্, প্রাচীন নাম ত্যাগ করিবার দরকার নাই, কিন্তু ভ্রান্তিবশে গৃহীত অর্ব্বাচীন হিন্দুনামটী ত্যাগ করিতে হইবে।

ইতিহাসের আলোচনায় জানা যায়, স্বামী দয়ানন্দের উক্তি ভিত্তিহীন নহে। ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের সহিত সিন্ধুপ্রদেশে প্রথম পারশীকগণের বাণিজ্যাদি-সংস্রব সংঘটিত হয়। পারশীকগণ এদেশকে সিন্ধুসংস্রবহেতু সিন্ধুস্থান বলিতেন। উচ্চারণবৈকল্যে 'সিন্ধুস্থান'এর 'স' উচ্চারিত না হওয়ায় এবং তৎপরিবর্ত্তে 'হ' উচ্চারিত হওয়ায় সিন্ধুস্থান "হিন্দুস্থানে" পরিণত হয় ও হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ 'হিন্দু' নামে পরিচিত হন। এরূপ উচ্চারণবৈকল্যের দৃষ্টান্ত এখনও বিদ্যমান আছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক লোক এখনও 'শ্যালা' স্থলে 'হালা' বলেন। পারশীকগণের কাছে সিন্ধু যেমন 'হিন্দু'তে পরিণত হইল, গ্রীক্‌গণের নিকট উহা তেমনি 'ইণ্ডাস্'রূপ ধারণ করিল। গ্রীক্‌গণ সিন্ধুকে "ইণ্ডাস্" ও সিন্ধুস্থানকে "ইণ্ডিয়া" নাম দিলেন। পরে মুসলমান্‌অধিকারের সময় হইতে জেতা মুসলমানেরা জিত আর্য্যসন্তানগণকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। আমরাও তখন হিন্দুনামে আত্মপরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত হইলাম।

স্বামী দয়ানন্দ বলেন—আমরা অর্ব্বাচীন হিন্দুনামে পরিচয় দিব না, বেদোক্ত শ্রেষ্ঠার্থক আর্য্য-নামে পরিচয় দিব। আর্য্যনাম আমরা কখনও ত্যাগ করি নাই, করিবও না, কারণ উহা আমাদের নিজস্ব। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উত্তম আচারগুলি পরিত্যাগ করিব না, তাহার উচ্ছেদসাধনের সঙ্কল্পও করিব না, কেবল নীচগণের মধ্যে সদাচার ও সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রচার করিয়া যোগ্যতা অনুসারে তাহাদিগের উন্নয়ন সাধন করিব।

গুণকর্ম্ম অনুসারে উন্নয়ন অবনয়ন ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি; সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করিব। যদি আর্য্যেতর-সমাজের কোনও লোক আর্য্যনাম-ধারণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া আর্য্যসমাজে স্থান লাভ করিতে চায়, তাহাকে প্রাচীন প্রথানুসারে সংস্কৃত করিয়া লইয়া আর্য্যসমাজে স্থান দিব। কিছুই ত্যাগ করিব না, কেবল প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রানুসারে যথাযোগ্য সংস্কার করিয়া লইব। জাতিভেদ উঠাইব না—গুণকর্ম্মানুসারী শাস্ত্রসঙ্গত জাতিভেদের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিব—ইহাই স্বামী দয়ানন্দের মনোভাব।

বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত ধর্ম্ম এবং সমাজসংস্কারক বুদ্ধদেবও আর্য্য-সমাজ ত্যাগ করিতে চান নাই। পরবর্ত্তিগ্রন্থে "বৌদ্ধধর্ম্ম" ও "বৌদ্ধসমাজ" প্রভৃতি শব্দ স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব স্বয়ং যে সমস্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—তাহার মধ্যে "সনাতন-ধর্ম্ম" ও 'আর্য্য' শব্দই দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সময়ে তাঁহার সমাজ আর্য্যসমাজেরই এক বিশিষ্ট অংশ ছিল। তিব্বত, শ্যাম, সিংহল, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হওয়ায় এবং বৌদ্ধরাজা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের চেষ্টায় বৌদ্ধসমাজ আর্য্য-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের তুল্যাধিকার প্রচার করিতেন। আর্য্যসমাজ ও বৌদ্ধসমাজ তখন একই সূত্রে গাঁথা ছিল। মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে গেলে, এখনও ভেদবুদ্ধির কারণ দেখা যায় না। ফলতঃ আর্য্যসমাজের প্রাচীন উৎকৃষ্ট

প্রথা-পদ্ধতির, আচার-অনুষ্ঠানের, নাম কুলাদি-পরিচয়ের উচ্ছেদ-সাধন কর্ত্তব্য নহে, তবে সংস্কার করা কর্ত্তব্য—ইহাই এ সম্প্রদায়ের অভিমত।

শিখগুরু নানক ভক্তিবাদের প্রচার করিয়া সামাজিক কঠোরতার মাত্রা হ্রাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জাতিভেদের বিলোপকারী যন্ত্র প্রণয়ন করিয়া যান নাই। নানক ভক্তিবাদের স্পর্শমণি দিয়া সকলকে স্বর্ণে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কাহাকেও বলপূর্ব্বক স্পর্শমণির সংস্রব হইতে দূরে রাখা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রভৃতি ভক্তিধর্ম্মের প্রচারকগণ ভক্তিপথে সকলের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জাতিভেদের বিলোপসাধন তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। ইদানীন্তন স্বামী বিবেকানন্দও কতকটা ঐরূপভাবেই অদ্বৈতবাদের সাহায্যে সমাজ-সমুন্নয়নে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই।

জ্ঞানগুরু আচার্য্যশঙ্কর গৃহস্থগণের মধ্যে জাতিভেদ আশ্রম-ভেদ প্রভৃতি যথাযথ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সন্নাসিগণের মধ্যে বর্ণাশ্রম-ভেদ রাখেন নাই। সন্ন্যাসী বর্ণাশ্রমভেদের অতীত, নিত্য-নির্ম্মুক্ত, গৃহস্থগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যেই অবস্থান করিতে বাধ্য—ইহাই আচার্য্যশঙ্করের অভিপ্রায়। বর্ত্তমানে দেখা যায়—আচার্য্যশঙ্করের প্রশিষ্য দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'গিরি'নামা সন্ন্যাসীরা চতুর্ব্বর্ণের লোকদিগকেই

সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া থাকেন, সরস্বতী ও ভারতী-নামা সন্ন্যাসীরা ত্রিবর্ণের লোককে সন্ন্যাসদীক্ষা দান করেন, শূদ্রগণকে ঐ অধিকার প্রদান করেন না। মোটের উপর আচার্য্যশঙ্করের মতে বর্ণাশ্রমভেদের স্থান আছে, আবার বর্ণাশ্রমবহির্ভূত সন্ন্যাসের স্থানও আছে।

তান্ত্রিকেরা শৈবধর্ম্মের প্রচার দ্বারা সকল সম্প্রদায়কে একক্ষেত্রে আনিতে চাহিয়াছিলেন। 'মহানির্ব্বাণতন্ত্র' পাঠে জানা যায়—শৈবধর্ম্মের সমতলক্ষেত্রে চতুর্ব্বর্ণের জনগণকে স্থাপন করিবার জন্য তান্ত্রিকগণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে তান্ত্রিকগণ যে উদার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শৈববিবাহ-বর্ণনায় প্রকট হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—"অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্‌বহেৎ শম্ভুশাসনাৎ" বিধবাবিবাহের এরূপ স্পষ্ট বিধান প্রচার করিয়া তান্ত্রিকগণ সমাজসংস্কারের ইঙ্গিত করিয়া যান নাই কি ?

গুরুগোবিন্দ সিংহ মুসলমান্-আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের শৌর্য্যশক্তি বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি দেখিলেন, আক্রমণকারিদের মধ্যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি-ভেদ নাই, প্রয়োজন হইলে সকলেই তরবারি ধারণ করিতে পারে ও করে, কিন্তু ভারতবর্ষে শুধু ক্ষত্রিয়জাতির উপর সামরিক কার্য্যভার ন্যস্ত আছে, ইহা শৌর্য্যসম্পত্তির অপব্যবহারের নিদর্শন। তিনি সমাজরক্ষা করিতে মনোযোগী হইয়া চতুর্ব্বর্ণের জনগণকে "সিংহ" আখ্যা দিয়া ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত করিলেন।

দেখা গেল, তিনি জাতিভেদ বিনষ্ট করিলেন না, কেবল সকল বর্ণের লোককে ক্ষত্রিয়-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেশকে অভয় প্রদান করিলেন।

ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির দিক্ দিয়া এরূপ চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এ চেষ্টা কতকটা হিন্দুসমাজের বহির্ভাগ হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। সাময়িকভাবে এসকল চেষ্টায় অনেক ফলও ফলিয়াছে।

অপরভাবে হিন্দুসমাজের মধ্য হইতেও যে প্রতীকার-চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে। পুরাণাদিশাস্ত্রে দেখা যায়, হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরেও মরণ-নিবারণের অনুকূল উদার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। অনেকে পুরাণশাস্ত্রকে অনুদার বলেন, কিন্তু তাঁহারা যদি অনুসন্ধিৎসা লইয়া সংযতচিত্তে পুরাণ পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, সমাজে পরিবর্ত্তন আনয়ন ও উদারতার অবতারণা করিতে পুরাণশাস্ত্র অদ্বিতীয়। পুরাণে যে উদারভাবের প্রচার-চেষ্টা আছে, তাহা সুস্পষ্ট। ঐ চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

উপনিষদের পরবর্ত্তিকালে স্ত্রীশূদ্রের শ্রুতিপাঠের অধিকার বিলুপ্ত হয়, স্ত্রীগণ ও শূদ্রগণ বেদপাঠে অনধিকারী—এইরূপ স্বীকৃত হয়। শূদ্রাদিরা এই অধিকার-লোপ চিরদিন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। যখন তাহারা বেদাধিকার লাভ করিবার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল, তখন পুরাণকার মহর্ষি সুকৌশলে শান্তি স্থাপন করিলেন। বেদে শূদ্রাদির অধিকার

নাই—এ মত বজায় থাকিল, পক্ষান্তরে পুরাণশাস্ত্রে বেদমন্ত্র সকল অবিকল সঙ্কলিত হইয়া শূদ্রাদির বেদপাঠস্পৃহা পূর্ণ করিতে লাগিল। কঠোপনিষদের মন্ত্র গীতায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরাণে, মহাভারতে বহু বেদমন্ত্র অপরিবর্ত্তিতভাবে কদাচিৎ অল্প পরিবর্ত্তিতভাবে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীমহাভারত ও পুরাণ, হিন্দু সাধারণের পাঠ্য, উহাতে সকলের সমান অধিকার। উহার অন্তর্গত বেদমন্ত্র পুরাণবাক্যরূপে শূদ্রাদির অধিকারে আসিয়াছে। পুরাণশাস্ত্রে এইরূপ উদারতা ও পরিবর্ত্তনের প্রচুর পরিচয় আছে। ইহা দ্বারা সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রভূত সাহায্য ও সুযোগ হইয়াছিল।

অতএব যখন দেখিতেছি, এদেশে ও অন্যদেশে ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ চিরকালই অবস্থামত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া সমাজের অনিষ্টের প্রতীকার করেন, সমাজরক্ষার পথ পরিষ্কৃত করেন, তখন বর্ত্তমানেও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার—সংস্কারের দ্বারা হিন্দুসমাজের আসন্ন অনিষ্টের প্রতীকার করা যাইতে পারে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, সমাজসংস্কার ধর্ম্মাচার-সংস্কার চিরদিন হইয়াছে ও হইবে, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, কিন্তু সে সংস্কার করিবে কে? সমাজসংস্কার রাজশক্তির সহায়তায় সম্পন্ন হয়, আর মহাপুরুষের চেষ্টায়ও হয়। অন্যথা সমাজসংস্কারের সম্ভাবনা নাই। জগতের কোনও দেশে কখনও মহাপুরুষের চেষ্টা অথবা রাজশক্তির সহায়তা ভিন্ন সমাজসংস্কার হয় নাই।

রাজাজ্ঞায় সমাজে পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ, বৈদেশিক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজার শাসনাধীনে কালযাপন করিতেছে। বিদেশীয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজা, আমাদিগের সামাজিক ব্যাপারে ও ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক, আমরাও এ গুরুভার ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত নহি, সুতরাং প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে কিরূপে? মহাপুরুষের চেষ্টায় সমাজসংস্কার হয় সত্য, কিন্তু সেরূপ মহাপুরুষ বর্ত্তমানে আবির্ভূত হন নাই। ভবিষ্যতে আসিবেন কি না, তাহাও জানা যায় না। মহাপুরুষের আবির্ভাব সুদূরভবিষ্যতে সম্ভব হইলেও ততদিন হিন্দুসমাজ ধ্বংসকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, ভগবান্ জানেন; এ অবস্থায় পরিবর্ত্তন বা সংস্কার হইবে কিরূপে?

অনেকে বলেন—"ব্রাহ্মণেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাই পরিবর্ত্তনের পরিপন্থী। তাঁহারাই নূতন পরিবর্ত্তনে বাধা দিয়া সমাজ-সংস্কারের পথ রুদ্ধ করেন।" স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলা যায়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা প্রকৃতপক্ষে এরূপ অনুযোগার্হ নহেন। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের মুখে শুনা গিয়াছে যে "আমাদের কথা শুনে কে? আমরা যে প্রথাকে শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করি, তাহারও সকলে অনুসরণ করে না, আবার যাহা দূষণীয় ও শাস্ত্রবহির্ভূত বলিয়া প্রচার করি, তাহা হইতেও কেহ বিরত হয় না। সমাজস্থ লোক নিজের সুবিধা ও সামর্থ্য অনুসারে

সদসৎকর্ম্ম করে, আমাদের কথা শুনে না। বরপণপ্রথা কুপ্রথা বলিয়া আমরা সমাজকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি। সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও ঐ মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্য্যকালে কেহ পণ্ডিত বা প্রবীণ লোকের মত গ্রহণ করে না, নিজের মতানুসারেই চলে।" বস্তুতঃ দেখা যায়, উদারমতদাতা পণ্ডিতের কথা কেহ শুনে না, অধিকন্তু তাঁহাকে সাধারণে সমাজে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে। পণ্ডিতের মতে সমাজ-সংস্কার হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। রাজনৈতিক-মতদাতা নেতাদের কথায় যেমন দেশ পরিচালিত হয় না. সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ের মতদাতা পণ্ডিতগণের কথায়ও তেমনি বিশেষ কিছু আসে যায় না।

এখন বিচার্য্য এই যে, সমাজসংস্কার অসম্ভব কি সম্ভব? সম্ভব হইলে, তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে?

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় বলেন—মহাপুরুষের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না। রাজশক্তির পরিবর্ত্তন দ্বারা সমাজসংস্কারের অনুকূল অবস্থা লাভ করিতে হইবে। রাজা অর্থে রাজশক্তির পরিচালক। যদি শাসনপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়, যদি ভারতে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, এককথায় যদি ভারতবাসীর হস্তে রাজশক্তি বা ভারতশাসন-শক্তি আসে, তখন সমাজ-সংস্কারের সম্ভাবনা হইবে। স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলে, ভারতবাসী স্বীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। রাজশক্তির ব্যবহার দ্বারা স্বদেশের স্ব-সমাজের স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণকল্পে প্রয়োজনীয়

পরিবর্ত্তনসাধন তখন বিশেষ কষ্টকর হইবে না। বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজরূপ জলাশয়ে বহু আবর্জ্জনা—শৈবালাদি মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে এই সমস্ত আবর্জ্জনা চলিয়া যাইবে। স্রোতস্বতী নদীতে আবর্জ্জনা বা শৈবাল জমিতে পারে না, খরবেগে অচিরে স্থানান্তরে নীত হয়। দীর্ঘকাল পরায়ত্ত শাসনের ফলে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ হিন্দু সমাজ পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের উন্মুক্ত স্রোত প্রবাহিত হইলেই সকল ক্লেদ কর্দ্দম শৈবাল শষ্পাদি দূরে বাহিত হইবে। প্রয়োজন মত জীবনরক্ষার যোগ্য ব্যবস্থা তখন ভারতীয় সমাজ স্বহস্তেই করিতে পারিবে। ফলতঃ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তন ভিন্ন হিন্দুসমাজের মরণ-নিবারণের অন্য পন্থা নাই—ইহাই এ পক্ষের অভিমত।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যাঁহারা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন অন্য উপায়ে ভারতীয় হিন্দুসমাজের জীবনরক্ষা হইতে পারে না—বলেন, তাঁহারা ইংরেজসম্পর্কশূন্য স্বায়ত্তশাসন চাহেন না। তাঁহারা বলেন, দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের সিংহলাঞ্ছিত পতাকার ছায়াশ্রয়ে আমরা অবসাদ শ্রান্তি দূর করিতে পারিয়াছি—এখনও আমরা ইংরাজ-পতাকাতলেই স্বায়ত্ত-শাসনের সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিব। আমরা ইংলণ্ডের লোকের মত "স্বাধীন প্রজা" হইতে চাই। ইংলণ্ডেশ্বর আমাদের রাজা থাকুন, কিন্তু আমরা আত্মশাসনে ইংলণ্ডের লোকের মত অধিকার পাইলেই হইল। এরূপ বৃটিশ-সংস্রবযুক্ত স্বায়ত্তশাসনই ভারতীয়

হিন্দুসমাজের আকাঙ্ক্ষিত। ঐরূপ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলেই সমাজসংস্কার হইবে—মঙ্গল হইবে।

(তৃতীয় প্রবন্ধ)

সংস্কার বা পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে হইলে, দুই প্রকারের কার্য্য করিতে হয়—এক উপযুক্ত-বিধান-প্রণয়ন, অপর প্রণীত-বিধানের প্রয়োগ। দেশের মনস্বী বিদ্বদ্‌বৃন্দ সম্মিলিত হইয়া হিতাহিত-বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক বিধান রচনা করিবেন, পরে রাজ-শক্তির সাহায্যে সমাজে—দেশে ঐ বিধানের প্রয়োগ বা প্রবর্ত্তন হইবে—ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। রাজানুমোদিত না হইলে কোনও বিধানই প্রতিপালিত হয় না। যেখানে বিধান প্রতিপালন না করিলে দণ্ড তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকে, সেখানেই বিধান কার্য্যকারী হয়।

প্রাচীনভারতের সংহিতাকার ঋষিরা রাজা ছিলেন না, অথচ তাঁহারা বিধান-প্রণয়ন করিতেন, কিন্তু সেই বিধানসমূহ রাজানু-মোদিত হইয়া রাজশক্তির সাহায্যেই সমাজে প্রচারিত হইত। রাজদণ্ডের ভয়েই লোকে সাধারণতঃ বিধান মানিয়া চলে। বর্ত্তমানকালে যাঁহাদের উপর সমাজের নেতৃত্বভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা কেহই রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন—দণ্ডদানে সমর্থ নহেন, কাজেই জনসাধারণ তাঁহাদের আদেশ উপদেশ মানিতে চায় না।

বিধান উৎকৃষ্ট হইলেই যে লোকে তাহা মানিবে, আর অপকৃষ্ট হইলেই যে লোকে তাহা মানিবে না, ইহা সম্ভব নয়। যে বিধান না মানিলে রাজদণ্ডের আশঙ্কা, সেই বিধানই প্রধানতঃ লোকে মানিয়া থাকে।

দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত। আমরা সাধারণতঃ ভিক্ষা দেই। কিন্তু, অনেক সময় সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম ভিক্ষা-ব্যবসায়ী লোককেও ভিক্ষা দিয়া থাকি, ইহা অসঙ্গত। ভিক্ষাব্যবসায়ী সুস্থ সবল লোককে ভিক্ষা দেওয়ায় সমাজের ক্ষতি করা হয়—আলস্য ও প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—পক্ষান্তরে উহাতে অর্থের অপব্যবহার হয়, ফলে প্রকৃত দানের পাত্রও বঞ্চিত হয়। যেখানে এই অনিষ্টের প্রতীকার-জন্য রাজবিধি-প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেখানে এই অসঙ্গত ব্যবহার হইতে পারে না। ইংলণ্ডে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ, ভিক্ষাগ্রহণও অপরাধজনক। কলিকাতার দক্ষিণাংশে সাহেবকোয়ার্টারেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। সেখানে রাজবিধি দ্বারা ভিক্ষাদান ভিক্ষাগ্রহণ উভয়ই বারিত হওয়ায়, প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের চাতুরীজালে কেহ পতিত হয় না। অবশ্য ঐ সকল স্থানেও স্বেচ্ছাদান নিষিদ্ধ নহে। আমাদের দেশে যদি ভিক্ষাব্যবসায়ীকে ভিক্ষা দিলে দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই ভিক্ষা দিতাম না। বিবাহে পণগ্রহণ (বরপণই হউক্ আর কন্যাপণই হউক্) অসঙ্গত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এ কুপ্রথা কেহ রহিত করিতে পারেন না ; কারণ, পণগ্রহণে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা

নাই। দণ্ড দ্বারা সব সময় অপরাধ সমূলে উৎপাটিত হয় না বটে, কিন্তু দণ্ডপ্রয়োগ থাকায় কুকর্ম্ম প্রশ্রয় পায় না, ইহা সত্য।

রাজবিধির সাহায্যে সমাজসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু রাজ-শক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে সমাজে উহার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। রাজবিধি দ্বিবিধ—এক বহুলোকের সম্মত হিতকর, অপর বহুলোকের মতবিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর। গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ অসঙ্গত মনে করিয়া ইংরেজরাজ ঐ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ প্রথার নিবারণকল্পে যে বিধান করা হইয়াছে, তাহা জনসাধারণের মতের বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়াই করা হইয়াছে। আবার এমন বিধান থাকিতে পারে, যাহা সমাজের ক্ষতিকর ও লোকমত-বিরুদ্ধ। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, হিতকর বিধান প্রণয়ন করিতে পারে আবার অহিতকর বিধানও করিতে পারে। প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের জনসাধারণের হিতকর বিধান প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে উহা দ্বারা উপকার না হইয়া প্রভূতমাত্রায় অপকার হইবার সম্ভাবনা; কারণ, অশিক্ষিত লোকেরা নিজেদের হিত-অহিত নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। বিদেশীয় রাজা, প্রজাবর্গের সমাজসংস্থান, প্রথা-পদ্ধতি, অভাব-অভিযোগ, সম্যগ্‌রূপ বুঝিতে পারেন না বলিয়া, প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ নির্ণয় করিতে পারেন না; প্রত্যুত তিনি স্বীয় সমাজের মানদণ্ড দ্বারা প্রজার সমাজকে

যাপিতে প্রস্তুত হন। ইহা সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলকর হইতে পারে না। অনেক অভিজ্ঞব্যক্তির মত এই যে, যে দেশ বিদেশীয় রাজশক্তির দ্বারা শাসিত, সে দেশে প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রবর্ত্তনই সঙ্গত। অবশ্য খাঁটী প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা রাজসংস্রবযুক্ত স্বাধীন প্রজাপুঞ্জের স্বায়ত্ত-শাসনই সমধিক সঙ্গত মনে হয়। সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞান-বৃদ্ধি হইলে, সেই সাধারণের দ্বারাই কল্যাণকর বিধান প্রণীত হইতে পারিবে এবং সেই বিধানের সাহায্যে সমাজসংস্কার সম্ভব হইবে।

রাজশক্তি ভিন্ন আর একটী শক্তি দ্বারাও মানুষ পরিচালিত হয়, সে শক্তি ধর্ম্মশক্তি। যেমন ইহলোকে রাজদণ্ডের ভয়ে ও ইহকালে লোকনিন্দার শঙ্কায় অনেকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয় এবং রাজদ্বারে সম্মান ও লোকপ্রশংসার আশায় অনেকে সৎকর্ম্ম করে, তেমনি পারলৌকিক অকল্যাণের ভয়েও অনেক লোকে কুকর্ম্ম করে না, আর পারলৌকিক মঙ্গলের আশায়ও বহুলোকে সৎকর্ম্ম করে। অনেক সময় আমরা ধর্ম্মবিশ্বাসে কর্ম্ম করি, আবার অনেক সময় রাজসম্মান ও সামাজিক প্রশংসার প্রত্যাশায় অনেকে কর্ম্ম করেন।

এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসবশতঃই শূদ্রান্ন-ভক্ষণ করেন না। আবার এমন অনেক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের বড় ধার ধারেন না, শত শত অখাদ্য-ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু "আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র অপেক্ষা উচ্চ" মাত্র এই অভিমানবশতঃই শূদ্রান্নভক্ষণ করেন না। এই জাত্যভি-

মানের সহিত যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাসের সংস্রব নাই বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের দোহাই আছে। মোটের উপর বলা যায়—মানুষের মনের গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস এক অপূর্ব্ব বস্তু। যাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়, তাঁহারা রাজদণ্ডের বা সামাজিক নিন্দার ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হন না, রাজকীয়-পুরস্কার বা সামাজিক-প্রশংসার আপ্যায়নেও হৃষ্ট হন না—ধর্ম্মবিশ্বাসেই কার্য্য করিয়া যান। যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাতে জাগরূক হয়, তাহার চেষ্টা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিশ্বাসে যিনি কার্য্য করেন, তিনিই যথার্থ সত্যের সমাদর করিতে পারেন। রাজবিধি অনেক সময় প্রকৃত সত্যের খাতির রাখে না। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মভাব "খুঁটিনাটি বিচার" নহে। প্রকৃত সত্য ও শ্রেষ্ঠজ্ঞান এবং ভগবদ্‌ভক্তির অনুসরণেই যথার্থ ধর্ম্মভাব নিহিত। এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। ত্যাগেই পরমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগরিত হয় না। ত্যাগী পুরুষ চাই।

গৃহস্থাশ্রম সকলের আশ্রয়স্থল। সকলের প্রতিপালক গৃহস্থ। অপর আশ্রমের লোকেরা ক্ষণকাল গৃহস্থাশ্রমরূপ বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় দাঁড়াইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা অবসাদ দূর করিয়া স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারেন; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমী মানব প্রশংসনীয়। কিন্তু, গৃহস্থ সম্পূর্ণ "পরের জন্য

নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারেন না। যাঁহার নিজের বলিতে কিছু থাকে, তিনি ষোলআনা পরের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারেন না। গৃহস্থ অনেক সময় নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যের ভালমন্দ ভাবিতে বাধ্য হন,—দেশের ভাবনা ভাবিবার অবসর পান না। দেশের যথার্থ কল্যাণসাধন করিতে হইলে, এমন কতকগুলি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন, যাহাদের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন নাই। বঙ্গের সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই কতকগুলি সংযত কর্ম্মী যুবক লইয়া "বাঙ্গালীসন্ন্যাসী" সম্প্রদায় গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা দেশে নীতি, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রচার দ্বারা সমাজকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন, এমন একদল সংযত কর্ম্মী চাই। দেশে এমন স্থান অনেক আছে, যে সব স্থানে স্বাস্থ্য-নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ের শিক্ষার প্রচুর অভাব বিদ্যমান। সেই সকল স্থানে জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয়-জ্ঞান-প্রচারের জন্য একদল নিঃস্বার্থ লোকের একান্ত প্রয়োজন। ২৩,০৬।

এদেশের অনেক লোকের "দেশের ও দশের প্রতি কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। অনেকে মনে করেন, "নিজের গৃহস্থালীর সুখ-সুবিধার অনুসন্ধান করা ভিন্ন আর আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই। দেশের অভাব অভিযোগের প্রতীকার রাজাই করিবেন। আমাদের সে সমস্ত বিষয়ে কিছুই দায়িত্ব নাই।" এরূপ শোচনীয় ভ্রমের অপনোদন একান্ত কর্ত্তব্য। রাজা টাকা দিয়া পরিষ্কৃত পানীয়জলের ও যোগ্য খাদ্যের ব্যবস্থা

করিয়া দিলেন না, অতএব আমরা পঙ্কিল দূষিতজল পান করিয়া ও কদন্নসেবন করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইব,—রাজা দাতব্যচিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন না, অতএব আমরা অকাতরে মরণকে বরণ করিয়া লইব,—রাজা অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন না, অতএব আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে কালযাপন করিতে কৃতসংকল্প হইব,—সাধ্যমত সমবেত শক্তির সহায়তায় সুপেয় জল, সুযোগ্য খাদ্য ও সুচিকিৎসার চেষ্টা বা সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিব না,—এরূপ ধারণা ঠিক নহে। রাজা যদি প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনে উদাসীন হন, তিনি যদি কর্ত্তব্যপালন না করেন, তবে যে আমরা কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইতে বাধ্য হইব—এরূপ বিশ্বাস কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই পোষণ করিতে পারেন না। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা যথাসাধ্য করিব এবং রাজা যাহাতে কর্ত্তব্যপরায়ণ হন—তদ্বিষয়েও প্রচুর যত্নচেষ্টা করিব—ইহাই সঙ্গত কথা। বিদেশীয় রাজা আমাদের সর্ব্ববিধ অসুবিধার সংবাদ রাখেন না। সংবাদ পাইলেও সকল সময় আমাদের সহায়তা ব্যতীত সকল অসুবিধার প্রতীকার করিতে পারেন না। আমরা যদি প্রকৃত পথে চলিতে থাকি, তবে আমরাই আমাদের বহু অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারি। দেশে স্বাস্থ্য, নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান-প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে পারিলে, অনেক অনিষ্টের প্রশমন হইতে পারে, মরণ-সমস্যার কতকাংশে মীমাংসাও হইতে পারে। দেশের মধ্যে জাতীয়ভাব জাগাইয়া তোলা—সকলের হৃদয়ে পবিত্র দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা করা প্রধান কর্ত্তব্য।

এই সার্ব্বজনীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, প্রত্যেক গ্রামে নগরে যাইয়া, যাহাতে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান জাতিসমূহের মধ্যে—জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সংস্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সকলে যাহাতে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এক-ভাব—এক উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, একলক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পাঁরে, তাহার জন্য কর্ম্মিসম্প্রদায়কে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে যদি অন্যসম্প্রদায়ের লোক আসিতে আগ্রহান্বিত হন, তবে তাঁহাকে স্থানদান করিতে হইবে। অন্য-সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুসমাজে চিরদিনই গৃহীত হইয়া আসিতে-ছেন। বর্ত্তমানেও সেই প্রাচীনপ্রথার সমাদর করিতে হইবে সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার অতিক্রম করিয়া, উদারতার আলোকময়ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যে সমস্ত লোক হিন্দুকুলজাত নহেন, তাঁহারাও যে প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজপুত-ক্ষত্রিয়গণ।

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইতিহাসাভিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত প্রতাপসিংহ গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুজরাৎ হইতে বুন্দেলখণ্ড এবং পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত, এই দুই রেখার দুই পাশেই একজাতীয় লোক সর্ব্বদা রাজা ও সম্ভ্রান্তদের

আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহারা অসংখ্য বংশ বা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও নিজদিগকে একবর্ণ মনে করিত, এবং ইহাদের আচার ব্যবহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ প্রায় একরূপই ছিল। এই জাতির নাম রাজপুত এবং ইহারা নিজদিগকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় দেয়।

কিন্তু ইহারা কি সেই প্রাচীনভারতের প্রথম ক্ষত্রিয়দের বংশধর? কই 'রাজপুত' শব্দটী বেদ, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে কোথাও পাওয়া যায় না। তাহাদের বংশের নাম যথা—গুহিলোট্, রাঠোর, কাচ্ছোয়া, ধঁধেড়া, গহরবাল প্রভৃতিও আট-শত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে কখন শুনা যায় নাই। আর্য্যগণ এদেশে বসতি আরম্ভ করিবার পরই বেদের সময়ে লোকের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহাদের সমাজ চারিবর্ণে ভাগ হইয়া গেল। যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা রাজন্য (ক্ষত্রিয়) নাম লইলেন এবং ক্রমে তাঁহারা শুধু নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করিয়া একটী পৃথক্ জাতি হইলেন। সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের সহিত আধুনিক রাজপুতদিগের যে নামের সম্বন্ধ নাই তাহা আমরা দেখিয়াছি।

তবে কি রক্তের সম্বন্ধ ছিল? তাহাও নহে। বর্ত্তমান রাজপুত রাজাদের বংশাবলীতে ঐতিহাসিক পুরুষদের নাম ৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পেঁছে না। যেন তাহার আগে তাঁহাদের বংশগুলি অজ্ঞাত, অখ্যাত বা পরদেশবাসী ছিল। আবার অতি দূরে দূরে স্থিত ভারতীয় নানাপ্রদেশে (যথা গুজরাৎ বঙ্গ উড়িষ্যা ও কামরূপে) প্রাচীনকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে

যে, সমাজে সুজাত ব্রাহ্মণ না থাকায় স্থানীয় রাজা কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সদ্‌ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদের বংশধরদের দ্বারা পবিত্র নব হিন্দুসমাজ গঠন করেন।

রাজপুতদের মধ্যেও এই ধরণের প্রবাদ আছে। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে পর মানবের শাসনকর্ত্তা না থাকায় দেশময় পাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। ঋষিদের কাতর প্রার্থনায় দেবগণ আবুপর্ব্বতের শিখরে গিয়া তথাকার অগ্নিকুণ্ড হইতে ৪ জন বীর সৃষ্টি করিলেন; তাঁহারা নবক্ষত্রিয় এবং পরিহার, প্রমার, সোলাঙ্কি এবং চৌহান বংশের আদিপুরুষ।

এই সব প্রবাদ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদেশীয় আক্রমণের অথবা ঘোরতর ও দীর্ঘ-কালব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে প্রাচীন হিন্দুসমাজ উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। বৈদিককাল হইতে আগত জাতিগুলির পুরুষ-পরম্পরার সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া অনেক জাতি নির্ব্বংশ, অনেক বংশ মিশ্রিত বর্ণসঙ্কর হইয়া যায়, এবং এই সব বিপ্লবের অবসানে নূতন বংশ লইয়া নূতন করিয়া চারিবর্ণ রচনা করিয়া নবহিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সপ্তম শতাব্দীর লোক-বিভাগের সময় ঠিক বৈদিকযুগের মতই শুধু ব্যবসায় দেখিয়া জাতিনির্দ্দেশ করা হইত, জন্ম দেখিয়া নহে। রাজপুতেরা এই নব্যক্ষত্রিয়।

তাহারা কোথা হইতে আসিল? রাজপুতবংশগুলির তালিকায় আমরা গুজার, বড়গুজার, হূন প্রভৃতি নাম পাই। গুজারজাতি

এখনও পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে বাস করে। তাহারা কৃষক, কিন্তু পূর্ব্বে পশুচারণকারী ছিল, এবং স্পষ্টই বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতি। অথচ এক গুজারবংশ (সংস্কৃত গুর্জ্জর) যোধপুর রাজ্যের ভিন্নমল্ল-নামক নগরে রাজধানী করিয়া একটী বড় রাজ্য স্থাপন করে এবং পরে নবম শতাব্দীতে পরিহার (সংস্কৃত প্রতিহার) নামক তাহাদের এক শাখা কান্যকুব্জ জয় করিয়া তথায় রাজ্যবিস্তার করে। তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশেরও রক্তের যোগ ছিল। রাজপুতেরা যে শকজাতীয় বিদেশী, তাহা টড্ সাহেব এক শতাব্দী পূর্ব্বেই অনুমান করেন। তাহার পরে গত একশত বৎসরের আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপকরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে যে, রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চবংশ অর্থাৎ চিতোরের মহারাণারা রামচন্দ্রের বংশধর বা সূর্য্যবংশীয় নহেন, তাঁহারা পারস্য বা অন্য কোন বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতির সন্ততি।

এই মহারাণার বংশের নাম গুহিলোট্ (সংস্কৃত গুহিলপুত্র গৌহিল্য,) এই বংশের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বাপ্পা অতি প্রাচীন। আবুপর্ব্বতের ১৩৪২ সংবতে উৎকীর্ণ এবং চিতোরের ১৩৩১ সংবতে খোদিত দুইখানি শিলালিপিতে এই বাপ্পাকে "ব্রাহ্মণ" ও "বিপ্র" বলা হইয়াছে। 'একলিঙ্গমাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে গুহদত্ত (গুহিল) কে "নাগর ব্রাহ্মণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাণা কুম্ভরচিত 'রসিকপ্রিয়া' গ্রন্থেও বাপ্পাকে "দ্বিজ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আরও একখানি প্রাচীনতর শিলালিপিতে

(একাদশ শতাব্দী সংবৎ) গুহিলবংশের এক শাখার রাজা বালাদিত্যকে পরশুরামের মত "ব্রহ্মক্ষত্রান্বিত" বলা হইয়াছে। এমন কি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত একখানি রাজস্থানী 'খ্যাৎ' অর্থাৎ কবিগাথায় মহারাণা-বংশের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"আদিমুল্ উৎপত্তি ব্রহ্ম, পণক্ষত্রী, জাঁনাঁ, আনন্দপুর সিনগার"—ইত্যাদি ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মূল হইতে তাঁহার উৎপত্তি, পরে আমরা তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানি, তিনি আনন্দপুরের শোভা।" ইত্যাদি। আনন্দপুর গুজরাতের 'বড়নগরের' প্রাচীন নাম, এবং নাগর ব্রাহ্মণদিগের আদি কেন্দ্রস্থল।

এখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে, 'গুহিলোট্' রাজারা প্রথমে "নাগর ব্রাহ্মণ" ছিলেন। অন্য শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, নাগর-ব্রাহ্মণেরা মৈত্রক নামক বিদেশী জাতিবিশেষ। ক্রমে গুহিলের পুত্রপৌত্রাদি কোশাকুশি ছাড়িয়া ঢালতলবার ধরিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন এবং ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যেই ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের (এবং বঙ্গের সেনরাজাদের) উপাধি 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থ আদৌ ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়ঃ অর্থাৎ আধুনিক ক্ষত্রিয়, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ।

এইরূপ ব্যবসায়ভেদে জাতিভেদ অর্থাৎ গীতার কথামত "জ্ঞানকর্ম্মবিভাগতঃ চাতুর্ব্বর্ণ লোক" সাজান আরও অনেক হিন্দুবংশে ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর

দেখাইয়াছেন যে, চৌহানবংশও প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল, পরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয় মধ্যে গণ্য হয়। কদম্ববংশও সেইরূপ। প্রতিহার-বংশে ব্রাহ্মণ-পিতা ও ক্ষত্রিয়-মাতার সন্তানকে "ক্ষত্রিয়" নাম দেওয়া হইত। ফলতঃ সেই যুগে সমাজ পুনর্গঠনের সময় যাহারা যুদ্ধ করিত বা রাজ্যশাসনে লিপ্ত থাকিত, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় উপাধি দেওয়া হইত। লোক যে বংশজাত, তাহার উপর তাহার জাতি নির্ভর করিত না।

অহিন্দু বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়া বসতি করিতে করিতে কত শীঘ্র ও কত বেমালুম্ হিন্দু হইয়া যাইত, আমাদের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পে লিখিয়াছেন "গয়েশউদ্দিনের পুত্র হরিদাস ঘোষ"—অর্থাৎ মুসলমানের ছেলে টাকার জোরে হিন্দু হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটা কাল্পনিক হইলেও প্রাচীন-ভারতে অনেকবার সত্যই ঘটিয়াছে। যথা—কুষাণ নামক শকজাতীয় রাজা কুজুল কদফিস্, তস্য পুত্র (বা পৌত্র) বিম কদ্‌ফিস্, তস্য পুত্র কণিষ্ক, তস্য পুত্র হুবিষ্ক (সব পাকা তুর্কমান্) তস্য পুত্র বসুদেব। গোখাদক মঙ্গোলীয় বর্ব্বর অহোমরাজা সুক্লেমুং তস্য পুত্র সুরাংফা, তস্য পুত্র সুত্যিংফা, তস্য পুত্র জয়ধ্বজ তস্য পুত্র চক্রধ্বজ, তস্য পুত্র রামধ্বজ ; আবার পারসিক 'সত্রপ' উপাধিকারী শকবংশীয় উজ্জয়িনীর রাজারাও এইরূপে হিন্দুসমাজে ঢোকেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ ঘঝামোটিক, তস্য পুত্র চষ্টন, তস্য পুত্র জয়দামন, তস্য পুত্র রুদ্রদামন।

ফলতঃ সেই প্রাচীনযুগে বিদেশীরা হিন্দু-আচার ও পূজাপার্ব্বণ মানিয়া লইয়া অতি সহজে হিন্দু হইয়া যাইত। ভারত ও ভারতের বাহিরের জগতের মধ্যে তখনও ধর্ম্মের এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর খাড়া হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম তখন সজীব ছিল, বিশ্ব-বিজয়ী ছিল, পলাতক একঘেয়ে ছিল না। হিন্দুসমাজের দেহ তখন সুস্থ, পরিপাকশক্তি অতি প্রবল; সে কত বিদেশী জাতি ও বংশ হজম করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, নিজদেহের রক্ত ও শক্তিতে পরিণত করিয়াছে, রাজপুতেরা তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

গোয়ালিয়ার রাজ্যে বেসনগরের প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে—

"দেবদেবস্য বাসুদেবস্য গরুড়ধ্বজোঽয়মংকারিতঃ ইহ হেলিওদোরেণ ভাগবতেন দিয়নপুত্রেণ তক্ষশিলাকেণ যোনদূতেন আগতেন মহারাজস্য অন্তলিকিতস্য উপেত্য সকাশম্ রাজ্ঞঃ কাশীপুত্রস্য ভাগভদ্রস্য" অর্থাৎ মহারাজ আন্তিআল্‌কিদের (Antealcidas) নিকট হইতে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সকাশে আগত যবনদূত দিয়ন (Dion) পুত্র হেলিওডোর (Heliodoors) যিনি তক্ষশিলাবাসী এবং ভাগবত অর্থাৎ বিষ্ণুপাসক— এখানে এই গরুড়ধ্বজ দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে স্থাপিত করিলেন। তখন যবন (গ্রীক্) ও হিন্দু হইতে পারিত। বিষ্ণুপূজা করিত, 'ভাগবত' উপাধি লইত। কিন্তু মুসলমানযুগে সে পথ বন্ধ হইল। ইহুদীধর্ম্মের এবং তাহার দুই শাখা খৃষ্টানি ও ইসলামের উপাস্য দেবতা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তিনি সেবক

হৃদয়ে অংশীদার সহিতে পারেন না। তিনি 'A living and a jealous God'. সুতরাং ভারতে আগত মুসলমান ও খৃষ্টানেরা শক্, অহোম, ক্ষত্রপ রাজাদের অথবা যবনদূত হেলিওড়োরের মত হিন্দু হইতে পারিল না। তাহারা চিরদিন পৃথক্‌জাতি ও সমাজ রহিয়া গেল। ক্রমে সময়ের গতিতে হিন্দুসমাজ নিজ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, ক্রমে চারিদিকে গণ্ডী দিল।

+ + + +

কিন্তু নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ বিদেশীকে নিজের অঙ্গ করিয়া লইত, আর তাহাকে নিজের ধর্ম্মে আনিয়া নৈতিক্ নবজীবন দান করিত। মধ্য-এসিয়ার মেষচারণকারী লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী যে সব শক হূন প্রভৃতি বর্ব্বর ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরাই রাজপুত। হিন্দু হইবার পূর্ব্বে তাহারা কি ছিল, এটিলা, জেঙ্গিজ খাঁ ও তোড়মন হূনের অনুচরগণের ব্যবহার হইতে তাহা বুঝা যায়। (অথবা মহাভারতে প্রভাসের পর আভীর ও যৌধেয়-জাতির কার্য্য হইতে।) তাহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিত্য অত্যাচার করিত, লুণ্ঠন তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় ছিল, তাহারা দয়া মায়া জানিত না। ষোড়শ শতাব্দীতেও অমুসলমান্ তুর্কমানেরা বোখারা লুঠ করিতে আসিয়া, দয়াভিখারী এক সাধু মৌলবী ও তাহার চারিশত বালক ছাত্রকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিয়াছিল। আর সেই জাতিই ভারতে আসিয়া হিন্দু হইয়া রাজপুতে পরিণত হইল, শৌর্য্য বীর্য্য ত্যাগ স্বামিধর্ম্ম (প্রভুভক্তি) এবং উদারতা

(Chivartryর) দৃষ্টান্ত হইল। হিন্দু হইয়া তাহারা আদর্শ মানিল কাহাকে ? রাজযোগী রামচন্দ্রকে, সিংহাসনত্যাগী ভরতকে, বীরকুমার সত্যপরায়ণ ভীষ্মকে, সীতা সাবিত্রীকে।

ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ সত্যই বলিয়াছেন "হিন্দু-ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ সত্য হিন্দুসভ্যতার আকর্ষণীশক্তি। ইহার বলে হিন্দুসমাজ মুসলমান্ ও ইউরোপীয় (না, খৃষ্টান) ব্যতীত আর সমস্ত বিদেশী আক্রমণকারীকে হজম করিয়া নিজের অংশে পরিণত করিয়াছে। যে সব হিন্দুরা বুঝেন না যে, কিরূপে তাঁহাদের দেশ, মধ্য-এসিয়ার গৃহহীন বর্ব্বরদিগকে পোষ মানাইয়া সভ্য করিয়াছে, উন্মত্ত তুর্কমান্ জাতিগুলিকে বিখ্যাত রাজপুত-রাজবংশে পরিণত করিয়াছে, তাঁহারা ভারতের প্রকৃত গৌরব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ।" A. M. T. Jackson I. C. S.

পূর্ব্বে যে ত্যাগীসম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই সর্ব্ববিধ কার্য্যে নেতৃত্ব করিবার যোগ্য। অবশ্য অসাধারণ শক্তিমান্ গৃহস্থ দ্বারাও একার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগী-সম্প্রদায়ের কর্ম্মঠ সন্ন্যাসীরাই এই কার্য্যের নেতৃত্ব লইবার যথার্থ অধিকারী। ত্যাগী বা সন্ন্যাসী, সমাজের খাতির রাখেন না—সমাজের ভ্রুকুটীদর্শনে ভীত হন না—নির্ভয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে পারেন। এই শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসিগণ একত্রে সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাধারণ অভিজ্ঞ গৃহস্থেরা, অজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচার করিতে পারেন। সন্ন্যাসী যথার্থ নেতা হইবেন, অভিজ্ঞ গৃহস্থ,

অজ্ঞগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিয়া সন্ন্যাসীর কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন, এইরূপ হইলে মঙ্গলের আশা করা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের শিক্ষিত গৃহস্থেরা অজ্ঞজনগণের কল্যাণ-সাধনার্থে কিছুই করেন না ; স্বীয় স্বীয় পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নেই তাঁহারা বিভোর। সমাজের হিতচিন্তা এবং হিতচেষ্টা করা গৃহস্থমাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া অন্যায়, সন্দেহ নাই।

যে কোনও সমস্যা উপস্থিত হউক্ না কেন, তাহার একটা মীমাংসা করাই যায়। যত্ন-চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। তবে নিশ্চেষ্টভাবে স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে, কোনও অনিষ্টেরই প্রতীকার করা যায় না। আপদের প্রতীকারার্থে চেষ্টা করায় দোষ নাই। আপাততঃ প্রচুর চেষ্টায়ও ফললাভ না হইতে পারে, হয়ত অনেকবার অকৃতকার্য্য হইতে পারি, কিন্তু অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিলে, কালে যে সুফললাভ ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না।

প্রাচীনভারতের সম্মুখে বহু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালের মনীষিগণ তাহার মীমাংসাও করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এক সময়ে যে উপায় অবলম্বন করায় যে সমস্যার মীমাংসা হয়, অন্য সময়ে সেই উপায় অবলম্বন করিলে সে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নদীবহুল দেশ বহুকাল পরে যখন নদীহীন হয়, তখন সেখানকার লোককে

পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী বা কূপ-খননের ব্যবস্থা করিতে হয় শৈশবের ব্যবস্থা যৌবনে চলে না, আবার যৌবনের ব্যবস্থা বার্দ্ধক্যে কার্য্যকরী হয় না। দেশকাল-পাত্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা চলে না। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে সমাজসংস্থান বা ধর্ম্মভাব যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানে অবিকল সেরূপ নাই, থাকিতেও পারে না। প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনের আয়োজন করিতে হয়। এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ আবির্ভূত হইয়া সময়োচিত শাস্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্নরূপ "যুগধর্ম্ম" প্রচার করিয়া থাকেন। এই জন্যই বিভিন্ন যুগধর্ম্ম ও যুগাবতারের আবশ্যক হইয়া থাকে। এক যুগে এক শাস্ত্র কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করে, অন্য যুগে অন্য শাস্ত্র দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা নূতন কথা নয়—শাস্ত্রের অক্ষয়ভাণ্ডারে ইহার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে দেখি—

কৃতে তু মানবাঃ ধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ মতাঃ।

সত্যযুগে মনূক্ত-শাস্ত্রবর্ণিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতমীয় ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খলিখিতের ধর্ম্ম এবং কলিযুগে পরাশর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্ম বিশেষভাবে অনুষ্ঠেয়। কলিধর্ম্মপ্রবক্তা মহামুনি পরাশর, কলির জন্য বিশেষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জ্জগতে, সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনস্রোত চলিতেছে। যেমন জড়জগৎ পরিবর্ত্তনের লীলাক্ষেত্র, ধর্ম্মজগৎও তেমনি।

কোনও অবস্থাই চিরস্থির নয়, সুতরাং কোনও ব্যবস্থাই অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না। সমাজের গতিপথ যখন বদলাইয়া যায়, তখন নূতন ভাব, নূতন শাস্ত্র ও নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হয়। ধর্ম্মাচার্য্যগণ নূতন শাস্ত্র প্রচার করেন—সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নূতন ব্যাখ্যার অবতারণা করেন, ইহার নিদর্শনের অভাব নাই। সমাজের গতি যেদিকে হয়, শাস্ত্রব্যাখ্যাও তাহারই অনুকূলে যায়। বিভিন্ন আচারের সমর্থনে শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ এ কথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্বদগ্রণী মাধবাচার্য্য মাতুলকন্যা বিবাহ করিবার অনুকূলে বেদাদিশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মনুবচনের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্বদ্বর রঘুনন্দন বঙ্গের স্বিন্নতণ্ডুল-ভক্ষণ (সিদ্ধ চাউল খাওয়া) সমর্থন করিতে গিয়া শাস্ত্রপ্রমাণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখাইয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। মোটের উপর 'যখন যেমন তখন তেমন' এই সাধারণ নিয়ম না মানিলে কল্যাণের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়—একথা এখন না বুঝিলে চলিবে না, আর এরূপ বুঝাও উচিত।

সকলেরই জীবনরক্ষার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। কি ব্যক্তিগতভাবে, কি জাতিগতভাবে, মরণনিবারণের চেষ্টায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। সকলেরই জীবনরক্ষার প্রযত্ন প্রশংসনীয়, কিন্তু অপরের ধ্বংসসাধনের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা সমীচীন নহে। আত্মস্বার্থে কাহারও ঔদাসীন্য সঙ্গত নহে, কিন্তু অপরের স্বার্থের অবিরোধে আত্মস্বার্থরক্ষাই শোভন ও সঙ্গত। যে ভাবে অপরের ব্যক্তিগত বা জাতিগত

স্বার্থের সহিত আত্মস্বার্থের সংঘর্ষ বা বিরোধ না ঘটে, প্রত্যুত সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সংঘটিত হয়, সেইরূপ ভাবে আত্মস্বার্থের অনুশীলনই সুসঙ্গত। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রযত্নই দেদীপ্যমান। এই ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত সমাজগত বা ধর্ম্মগত স্বার্থের সামঞ্জস্য বা যোগরক্ষা হইতেছে না, ইহা সুলক্ষণ নহে। সকল প্রকার স্বার্থের সামঞ্জস্যে দৃষ্টি রাখিয়া অপরের স্বার্থের অবিরোধে আত্মস্বার্থসাধনের প্রযত্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের সমস্যার সুমীমাংসা হইবে। হয়ত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে গেলে, আপাততঃ বহুবার বিফলকাম হইতে হইবে, কিন্তু পরিণামে যে কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সর্ব্বসামঞ্জস্যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, সমগ্র জগতের মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। আমরা আপাততঃ যে উপায়ে সমস্যার সমাধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, জগতের অন্যান্য জাতি সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি না, তাহার আলোচনায়—অনুশীলনে ইষ্টলাভ ভিন্ন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই। মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, হয়ত আমরা দেখিতে পাইব, আমরা বর্ত্তমানে যে সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছি না, অপরজাতি সে সমস্যার সুচারুরূপ সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি এমন হয় যে, তাঁহারা এবং আমরা ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে থাকায় তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় সর্ব্বাংশে আমাদের পক্ষে

হিতকর হইতে পারে না, তাহা হইলেও একথা সত্য যে, আমরা তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ের আলোচনা দ্বারা নিজেদের হিতকর উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় ও চেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্যলাভ করিতে পারিব। এই সাহায্যলাভ কি উপেক্ষণীয়? তুলনামূলক সমালোচনায় আমরা গ্রাহ্য উপায় যদি নাই পাই, ত্যাজ্য স্থির করিতে পারিলেও তাহাই যথেষ্ট লাভ। বিদেশীয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের অবলম্বিত উপায় যদি উত্তম হয়, তবে আমরা তাহার অনুসরণ করিব না কেন? পৈতৃক "পচাপুকুরের" কদর্য্য জল পান করিব, তথাপি অপরের অবলম্বিত নির্দোষ উপায়ে তাহা শোধন করিয়া পান করিতে প্রস্তুত হইব না, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। আমরা দেখিতেছি, একজাতীয় জ্বরের নিবারণে কুইনাইন্‌নামক বৈদেশিক তিক্ত ঔষধ অমোঘশক্তিশালী। অস্মদ্দেশে বহুকাল হইতে গুলঞ্চ, নিম, নাটা প্রভৃতি যে সকল জ্বরনাশক তিক্তদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাদের কোনওটাই ঐজাতীয় জ্বরের নিবারণে কুইনাইনের সমকক্ষ নহে। এরূপ অবস্থায় কি আমরা ঐজাতীয় জ্বর হইলে পেরুদেশীয় কুইনাইন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া জ্বরের কবলে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিব? অন্যদেশীয় লোকেরা যেমন তাঁহাদের ভেষজবিজ্ঞানে এদেশের অশোক, কালমেঘ, গুলঞ্চ, চিরতা, নিম প্রভৃতিকে স্থান দিতেছেন, আমরাও তদ্রূপ পেরুর কুইনাইন্‌কে অস্মদ্দেশীয় ভেষজবিজ্ঞানে স্থানদান করিব না কেন? আমাদের জানা উচিত—

"তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ

পিবন্তি," অপরের ভালটুকু লইব, মন্দটুকু লইব না—ইহাই সঙ্গত।

অন্ধ অনুকরণ কল্যাণদায়ক নহে। একদল মনে করেন—বিদেশের সবই উত্তম, আবার একদল মনে করেন—এদেশের সবই উৎকৃষ্ট। এই উভয় দলই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী। বিদেশে স্বদেশে সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট আছে। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কোনও দেশের বা জাতির একচেটীয়া নহে। অপর-দেশের সামগ্রী লইবার সময় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। বিদেশেও মন্দ আছে।

ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ আমেরিকায় গিয়া চণ্ডনীতির সহায়তায় স্বার্থঘটিত সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গগণ আমেরিকায় গেলে আমে-রিকার আদিম অধিবাসী রক্তাঙ্গ মানবগণের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ-সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। তখন শ্বেতাঙ্গগণ, শ্বেতাঙ্গ ও রক্তাঙ্গের স্বার্থের সামঞ্জস্য-সাধনে অসমর্থ হইয়া, চণ্ডনীতি বা ধ্বংসনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন—অধিকাংশ রক্তাঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া শ্বেতাঙ্গগণের স্বার্থের বিরোধী রক্তাঙ্গের স্বার্থের উচ্ছেদসাধন করেন। এখনও আমেরিকায় রক্তাঙ্গমানবের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এখন আর মানবসমাজে তাহাদের স্থান নাই—অরণ্যে পর্ব্বতে মানব-সভ্যতার অগোচরে তাহারা অমানুষ বন্যজীবন যাপন করিতেছে। এক্ষেত্রে ধ্বংসনীতি জয়যুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মানবসভ্যতার সমুজ্জ্বল অংশের অন্তর্নিবিষ্ট

নহে, সুতরাং এক্ষেত্রে সমস্যার সুমীমাংসা হইয়াছে বলা যায় না।

সুন্দরবনে গিয়া আমরা যখন কাষ্ঠচ্ছেদন ও শস্যরোপণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন সুন্দরবনের অধিবাসী ব্যাঘ্রাদির সহিত আমাদের স্বার্থ-সংঘর্ষ ঘটে; ফলে আমরা ব্যাঘ্রকুলের বিনাশ-সাধনে যত্নবান্ হই। ব্যাঘ্রও বিশ্বরাজ্যের প্রজা। বিশ্বজনীন সাম্যের একতানে ব্যাঘ্রের স্বরও প্রয়োজনীয়। ব্যাঘ্রজাতির ধ্বংসসাধন কখনই সঙ্গত নহে। বিশ্বের কোনও জীবজাতি বা কোনও দ্রব্যবিশেষ নিরর্থক নহে। সকলেই স্ব স্ব অধিকারে বিদ্যমান থাকিয়া বিশ্বমঙ্গলের এক এক অংশের অভিনয় করে। ব্যাঘ্রজাতির ধ্বংসসাধন অধর্ম্ম। রক্তাঙ্গমানব-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ-সাধন তদপেক্ষা অধিকতর অন্যায়। ব্যাঘ্র ইতরজীব, কিন্তু রক্তাঙ্গমানব মানবই বটে, তাহারও জীবনরক্ষার প্রয়োজন আছে। অতএব বলা যায়, ধ্বংসনীতির আশ্রয়ে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। অসভ্যসমাজে ধ্বংসনীতির প্রচলন আছে। অসভ্য-সমাজের জনগণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিনষ্ট করিয়া সেবা ও জীবিকা-ঘটিত সমস্যার মীমাংসা করিয়া থাকে। অসভ্যসমাজে নিজের জীবিকার জন্যই সকলে শ্রম করিতে বাধ্য হয়, বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য লোকের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে, নিজ জীবিকার্থে সম্পূর্ণশ্রমের বিনিয়োগ ঘটে না—সেবার জন্যও শ্রমের একভাগ ব্যয় করিতে হয়; কাজেই সেবার্থে সময় ব্যয় করিতে অপারগ হইয়া অসভ্যেরা সেব্য বৃদ্ধকে বিনাশ করিয়া সহজে

সমস্যার মীমাংসা করে। অসভ্য মানবগণের মধ্যে মানবত্বের বিকাশ না হওয়াতেই তাহারা এইরূপ মীমাংসার সমাদর করিতে পারে। মানবত্ব পরিস্ফুট হইলে মানুষ উপলব্ধি করে—সেবার মধ্যেই কর্ত্তব্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণেই সুখের বাস, ধ্বংসের মধ্যে শান্তিসুখের স্থান নাই।

সভ্য মানবসমাজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে ভাবে এই স্বার্থসমস্যার মীমাংসা করিয়াছে, তাহারা সকলই এই শ্রেণীর নয়। প্রাচীন-ভারতের হিন্দুগণ চণ্ডনীতির আশ্রয় না লইয়া সমন্বয়নীতির সাহায্যেই এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। আর্য্যগণ যখন পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন ভারতের অধিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা অনার্য্যগণের উচ্ছেদসাধন করিতে চাহেন নাই, অনার্য্যগণকে আর্য্যসমাজে স্থান দিয়া সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখি—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ।

আর্য্যসমাজের তিনবর্ণ দ্বিজাতি, শূদ্র একজাতি এই চারিবর্ণ, পঞ্চম বর্ণ নাই। পরে কিন্তু অনার্য্য নিষাদগণ আর্য্যসমাজে গৃহীত হওয়ায় "নিষাদঃ পঞ্চমোবর্ণঃ" লেখা হইল। মাদ্রাজে এখনও "পঞ্চম" বর্ণ বিদ্যমান। বেদের 'পঞ্চজন' ও এই পঞ্চম-বর্ণের মত। অনার্য্যজাতির নানাশাখায় নানাসম্প্রদায়কে ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজে গ্রহণ করা হইয়াছে, এই সংবাদ শাস্ত্রে

নানাস্থানে নানাভাবে বর্ণিত আছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌সের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু বহিব্যাপারে কতকগুলি সাধারণ-নিয়মের অধীন, তদ্রূপ প্রাচীন অনার্য্যগণ স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে পূর্ণ-স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, আবার আর্য্য-অনার্য্য-সাধারণ কতকগুলি নিয়ম তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইত। প্রথমতঃ এইরূপ ভেদাভেদের মধ্যে তাঁহারা ছিলেন। শেষে দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে অনার্য্যগণের উন্নতি হওয়ায় আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে একেবারেই স্বসমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অবস্থানুসারে উচ্চ অধিকারও দিয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যসমাজ সংরক্ষণনীতির সহায়তায় সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যতদিন ভারতীয় সমাজ স্বাধিকারে বিদ্যমান ছিল, ততদিন এই সংরক্ষণ-নীতি বা সামঞ্জস্য-মত অনুসারে সকল সমস্যার মীমাংসা হইত। পরাধিকারে সমাজের সে শক্তির হ্রাস হওয়ায় বর্ত্তমান দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। সামঞ্জস্যরক্ষার শক্তি হারাইয়াই সমাজ শতদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে শক্তি—সে অব্যাহত সামঞ্জস্য থাকিলে দেশের—সমাজের বর্ত্তমান দোষসমূহ উপস্থিত হইত না। সামঞ্জস্যস্থাপন-শক্তির পরিচালনা করিতে পারিলেই হিন্দুসমাজের ভীষণ সমস্যার সমাধান হইবে। পরায়ত্ত শাসনের ফলে সমাজ সামঞ্জস্যশক্তি হারাইয়া জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের শক্তি আবার আবির্ভূত হইবে।

(চতুর্থ প্রবন্ধ)

মহর্ষি যাস্ক প্রণীত 'নিরুক্ত' গ্রন্থে যে সকল মনুষ্যবাচক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের আলোচনা করিলে আর্য্যসমাজের ইতিহাসের একটী ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে উহার মধ্যে হিন্দু-সমাজের সমস্যার মীমাংসার প্রচুর উপকরণ লাভ করা যায়।

নিরুক্তে দেখা যায় মনুষ্যবাচক শব্দ ২৫টী যথা—মনুষ্যাঃ, নরঃ, ধবাঃ, জন্তবঃ, বিশঃ, ক্ষিতয়ঃ, কৃষ্টয়ঃ, চর্ষণয়ঃ, নহুষঃ, হরয়ঃ, মর্য্যাঃ, মর্ত্ত্যাঃ, মর্ত্তাঃ, ব্রাতাঃ, তুর্ব্বশাঃ, দ্রুহ্যবঃ, আয়বঃ, যদবঃ, অনবঃ, পুরবঃ, জগতঃ, তস্থুষঃ, পঞ্চজনাঃ, বিবস্বন্তঃ, পৃতনাঃ—ইতি পঞ্চবিংশতির্মনুষ্যনামানি।

প্রথম নাম মনুষ্য। মনুষ্য শব্দের অর্থ "মত্বা কর্ম্মাণি সীব্যন্তি" স্কন্দস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "জ্ঞাত্বা অনেনেদমিতি সাধ্য-সাধনভাবং কর্ম্মাণি সীব্যন্তি সংতন্বন্তি" অর্থাৎ ইহার দ্বারা ইহা হইতে পারে, এইরূপ সাধ্যসাধনভাব অবগত হইয়া, যাহারা কর্ম্ম বিস্তার করে, তাহারা মনুষ্য। তাৎপর্য্য এই যে যাহারা মনন করিয়া বা কার্য্যকারণভাব বিচার করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করে তাহারা মনুষ্য। মনুষ্যেতর জীবগণ মনুষ্যের ন্যায় বিচারবুদ্ধি-সহকারে কার্য্য করিতে পারে না। এই মনন বা বিচারবুদ্ধিই মানুষের বিশেষত্ব।

দ্বিতীয় নাম 'নৃ' বা নর। এই শব্দের অর্থ "নয়ন্তি সংসার-চক্রম্, পদার্থত্বাৎ দেশান্তরং নীয়ন্তে, নৃত্যন্তি গাত্রবিক্ষেপং কুর্ব্বতে

হি নিয়মেন গাত্রাণি বিক্ষিপন্তি কর্ম্মসু তানি কুর্ব্বন্তঃ”—যাহারা সংসার-চক্র পরিচালন করে, অথবা যাহারা স্থানান্তরে নীত হইতে পারে, অথবা যাহারা নিয়মিতভাবে গাত্র-বিক্ষেপপূর্ব্বক কর্ম্ম করে তাহারা নৃ বা নর।

তৃতীয় নাম ধব। “ধুনোতি স্বাবয়বান্ + + যদ্বা মনুষ্যা মৃত্যুতো বেপন্তে।” অর্থাৎ যাহারা নিজ দেহের অবয়ব বা অঙ্গ সকলকে কম্পিত করে, কিম্বা যাহারা মৃত্যুভয়ে কম্পিত হয়, তাহারা ধব।

চতুর্থ নাম জন্তু। নিরুক্তের অভিপ্রায় “জায়ন্তে জন্তবঃ” যাহারা জন্মশীল তাহারা জন্তু।

পঞ্চম নাম বিশ্। ইহার অর্থ “বিশন্তি অনুপ্রবিশন্তি সর্ব্ব-কর্ম্মসু অধিকারিত্বেন” অর্থাৎ যাহারা সকল কার্য্যে অধিকারিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহারা বিশ্।

ষষ্ঠ নাম ক্ষিতি। ক্ষিতি শব্দের অর্থ “ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি ভূমৌ গচ্ছন্তি বা তস্মাৎ”। যাহারা ভূমিতে বাস করে অথবা যাহারা ভূমিতে গমন করে (মৃত মনুষ্যের দেহ দাহ করিলে তাহা মাটিতে মিশিয়া যায়, ভূমিতে প্রোথিত করিলেও তাহা মাটিতে প্রবেশ করে।) তাহারা ক্ষিতি।

সপ্তম নাম কৃষ্টি। ইহার অর্থ “কৃষ্টং কর্ষণং + + তদস্যাস্তীতি কর্ষণেন কর্ম্ম-বিশেষেণ অত্র সামান্যতঃ কর্ম্মমাত্রং লক্ষ্যতে, তৎ কর্ম্ম অস্যাস্তীতি বা।” যাহারা কর্ষণ করে বা যাহারা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহারা কৃষ্টি।

অষ্টম নাম চর্ষণি। ইহার অর্থ "চরণবন্তঃ চরণশীলাঃ+ + যদ্বা আকর্ষন্তি বশীকুর্ব্বন্তি * * যদ্বা চর্ষণয়ঃ চায়িতারঃ দ্রষ্টারঃ সর্ব্বেষাং পদার্থানাম্।" যাহারা বিচরণশীল, অথবা যাহারা (ইতরজীবগণকে) বশীভূত করে, কিম্বা যাহারা সমস্ত পদার্থ দর্শন করিতে পারে, তাহারা চর্ষণি।

নবম নাম নহুষ। "নহ্যন্তেকর্ম্মভিঃ পূর্ব্বকৃতৈঃ সংসারে—নহ্যন্তি বা নহনীয়ম্" যাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা সংসারে বদ্ধ হয় তাহারা নহুষ, অথবা যাহারা বন্ধনযোগ্যকে বদ্ধ করিতে পারে তাহারা নহুষ।

দশম নাম হরি। ইহার অর্থ—"হরন্তি পদার্থান্+প্রসহ্যী-ক্রিয়ন্তে বা মৃত্যুনেতি।" যাহারা পদার্থ সকলকে হরণ করে অথবা যাহারা হঠাৎ মৃত্যু কর্ত্তৃক হৃত হয় তাহারা হরি।

১১। ১২। ১৩ মর্য্য, মর্ত্ত্য ও মর্ত্ত। অর্থ—'ম্রিয়ন্তে'। যাহারা মরণশীল তাহারাই মর্য্য, মর্ত্ত্য ও মর্ত্ত।

১৪। ব্রাত। ইহার অর্থ—"বৃণ্বন্তি স্বমভিমতং দেবতাভ্যঃ তপসারাধিতেভ্যঃ+ +প্রব্রিয়ন্তে বা যজ্ঞাদৌ। যদ্বা ব্রাতো ধান্যাদিসঞ্চয়ঃ তদ্বন্তো ব্রাতাঃ।" যাহারা আরাধিত দেবগণের নিকট হইতে স্বীয় অভিলষিত পদার্থ অনুসন্ধান করে, অথবা যজ্ঞে বৃত হয়, কিংবা যাহারা ধান্যাদি সঞ্চয় করে তাহারা ব্রাত।

১৫। তুর্ব্বশ। ইহার অর্থ—"হিংসন্তি প্রাণিনঃ, হিংস্যন্তে ব্যাধ্যাদিভির্বা।" যাহারা প্রাণি হিংসা করে, অথবা যাহারা ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা হিংসিত হয় তাহারা তুর্ব্বশ।

১৬। দ্রুহ্যু। ইহার অর্থ—"দ্রোহং পরেষামিচ্ছন্তি" অর্থাৎ যাহারা পরের অপকার ইচ্ছা করে তাহারা দ্রুহ্যু।

১৭। আয়ু। ইহার অর্থ—"গচ্ছন্তিগ্রামাদ্‌গ্রামম্‌" অর্থাৎ যাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে তাহারা আয়ু।

১৮। যদু। ইহার অর্থ—"যম্যতে নিয়ম্যতে আচার্য্যেণ অপথপ্রবৃত্তঃ রাজ্ঞা বা।" যাহারা আচার্য্য কর্ত্তৃক নিয়মিত হয় অথবা রাজা কর্ত্তৃক কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় তাহারা যদু।

১৯। অনু। ইহার অর্থ—"অনন্ত্যনবঃ + + ধর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানাৎ প্রাণনস্য ফলবত্বাৎ অনন্তীত্যুচ্যন্তে।" যাহারা প্রাণনসম্পন্ন অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের প্রাণন সফল হয় তাহারা অনু।

২০। পুরু। ইহার অর্থ—"পূরয়িতব্যাঃ কামানাং।" অর্থাৎ যাহারা কাম কর্ত্তৃক পূরয়িতব্য বা পূরণীয় তাহারা পুরু।

২১। জগৎ। অর্থ—"গচ্ছন্তি যে" যাহারা গমন করে তাহারা জগৎ।

২২। তস্থুষ। অর্থ—"তিষ্ঠন্তি যে" যাহারা অবস্থান করে তাহারা তস্থুষ।

২৩। পঞ্চজন। ইহার অর্থ—নিরুক্তভাষ্যে "চত্বারো বর্ণাঃ নিষাদঃ পঞ্চমঃ ইত্যৌপমন্যবঃ। পঞ্চভিভূ́তৈর্জ্জাতাঃ পঞ্চজনাঃ বা।" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চবিধ শ্রেণী-বিভাগ যাহাদের আছে তাহারা পঞ্চজন অর্থাৎ মনুষ্যসমাজ এই ভাবের শ্রেণীবিভাগ দ্বারা গঠিত। এখানে ভারতীয় আর্য্যসমাজের

কথাই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতসমবায়ে গঠিত বলিয়া মনুষ্য পঞ্চজন।

২৪। বিবস্বৎ। ইহার অর্থ—"বিবিধং বসনং বিবঃ, তদ্বন্তঃ বিবস্বন্তঃ।" মনুষ্যেরা নানাবিধ বসন ধারণ করে এজন্য তাহারা বিবস্বৎ নামে পরিচিত।

২৫। পৃতনা। ব্যায়ামার্থক 'পৃঙ্' ধাতু হইতে পৃতনা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহারা ব্যায়ামশীল বা ব্যায়ামরূপ অঙ্গচালনা-পরায়ণ, তাহারা পৃতনা।

নিরুক্তের ব্যাখ্যায় এক একটী শব্দের বহু ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইলেও এই পঞ্চবিংশতিটী নামের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা আপাততঃ যাহা বুঝিব, তাহা এই—মনুষ্যনামের মূল যে মনন বা বিচারশক্তি, তাহা মনুষ্যগণকে পশ্বাদি ইতরজীব হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

'নৃ' বা 'নর' নামের মূল পরিচালকত্ব বা নেতৃত্ব। যখন আদিমযুগে মনুষ্যগণ পশ্বাদি জীবগণের উপর প্রভুত্বস্থাপন করিয়া প্রয়োজনমত পশুধারণ ও পশুচারণ করিতেন, তখন তাঁহারা নৃ নর বা "নেতা" নাম লইয়াছিলেন। বহুকাল পরে যাজ্ঞিকতার যুগে এই শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হয়। তখন বলা হয়, মনুষ্যগণই যজ্ঞাদিকর্ম্ম দ্বারা সংসারচক্রের পরিচালন করেন। মনুষ্যগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ধূম হইতে মেঘ জন্মে, ঐ মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আর তাহারই ফলে ধরণীবক্ষে ফল-শস্যসম্পৎ প্রকাশ পায়।

জল শস্য ফল সকলই মনুষ্যের যত্নের প্রসাদে পাওয়া যায়, সুতরাং মানুষই সংসারের পরিচালক।

'ধব' নামের মূল অঙ্গকম্পান। সেই আদিকালের মানুষগণ প্রকৃতির ভীমকান্তমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গীসহকারে আনন্দ, বিস্ময় ও ভয় প্রভৃতি প্রকাশ করিতেন, সেই অঙ্গবিক্ষেপ হইতেই মনুষ্যগণ ধব-নাম পাইয়াছিলেন।

জন্তুনামের মূল জন্ম। আদিযুগের মানুষেরা জগতে এমন অনেক সামগ্রী ও জীব দেখিতেন, যাহাদের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পশ্বাদিরা প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। মনুষ্য তখনও 'গোত্র' বন্ধন করিয়া যথারীতি গোপালন করিতে আরম্ভ করেন নাই। প্রয়োজনমত স্বচ্ছন্দচারী বন্য পশু ধরিয়া নিজেদের কার্য্যে লাগাইতেন মাত্র। তাঁহারা দেখিতেন— তাঁহাদেরই সন্তানাদি জন্মিতেছে। কাজেই তাঁহারা মনে করিতেন, মনুষ্যই জন্তু বা জন্মশীল।

বিশ্‌নামের মূল প্রবেশ। এই নাম যখন মনুষ্য কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তখনই সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যেরা নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়স্থানে অর্থাৎ পর্ব্বতগুহাদিতে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন মানুষেরা সকলে প্রয়োজনমত সকল কার্য্যই করিতেন, কাজেই তাঁহারা সকল কর্ম্মের অধিকারজ্ঞাপক বিশ্ বা কর্ম্মপ্রবিষ্ট নামে পরিচয় দিতেন।

ক্ষিতি-নামের মূল ক্ষিতি বা মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ। মাটীতে তাঁহারা বাস করিতেন অর্থাৎ মাটীর টীপি প্রস্তুত করিয়া তাহার

উপর শয়ন করিতেন। খট্টা বা পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ মরিয়া গেলেও তাঁহারা মৃতদেহ ভূমিতে প্রোথিত করিতেন। বাসস্থানের নামে পরিচয় দেওয়া দীর্ঘকাল হইতে এদেশে বিদ্যমান। কুরুদেশের লোকেরা 'কুরু' নাম পাইত। পঞ্চালদেশের লোকেরা 'পঞ্চাল' নামে পরিচয় দিত। মানুষ ক্ষিতিতে বাস করে, এভাবেও মানুষ ক্ষিতি।

কৃষ্টি নামের মূল কর্ষণ। এই নামে যখন মানুষ পরিচয় দিয়াছেন, সেই সময় মানুষ সর্ব্বপ্রথম কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ কৃষিকারী মানবগণ আপনাদিগকে 'আর্য্য' বা কর্ষক বলিয়া পরিচয় দিতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা প্রকৃতিজাত নীবারাদি ও ফল মূল ভক্ষণ করিতেন অথবা পশুমাংস দ্বারা উদর পূরণ করিতেন।

চর্ষণি নামের মূল বিচরণ—অর্থাৎ দলবদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে গমন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা অতিদূরে যাইতেন না। ক্রমে কর্ষণযোগ্য ভূমির অল্পতা হওয়ায় ও বংশবৃদ্ধি ঘটায় দলবদ্ধ হইয়া সুবিধাজনক স্থানের অন্বেষণে বাহির হন। এই সময় 'চর্ষণি' বা ভ্রমণকারী নাম হয়।

বিবস্বৎ নামে পরিচিত হইয়া তাঁহারা বসনের বাহুল্যের পরিচয় দিলেন। নহুষ নামের মূল বন্ধন। যখন আর্য্যগণ বা কর্ষকজাতি স্বচ্ছন্দচারী পশু দ্বারা কৃষিকার্য্য ও ভারবহনাদি অসুবিধাজনক মনে করিতে লাগিলেন, তখন লতা বা রজ্জু প্রভৃতির সাহায্যে পশুগণকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া রীতিমত পশুপালন

আরম্ভ করিলেন। প্রয়োজনমত পশুগণকে সঙ্গে লইয়াই স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা নহুষ বা (পশু-) বন্ধনকারী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সময় অপর সম্প্রদায়ের মানুষেরা কখনও কখনও ইঁহাদের পশু প্রভৃতি হরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইত। ইঁহারা সেই সমস্ত মানবগণকেও ধরিয়া বন্ধন করিয়া রাখিতেন। এইরূপে ইঁহারা বন্ধনকারী বা নহুষ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে অভাবের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সময় আর্য্যগণ অপর সম্প্রদায়ের মানবগণের সংগৃহীত সামগ্রীসমূহ হরণ বা বল প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গৌরবপূর্ণ হরি বা গ্রহণকারী নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।

মর্য্য, মর্ত্ত্য ও মর্ত্ত নামত্রয়ের মূল মরণ। মানবগণ মৃত্যুর কবলে পতিত হয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া, প্রাচীন মানবেরা, নিজ-দিগেরও মরণ অবশ্যম্ভাবী মানিয়া লইয়া, মর্য্য মর্ত্ত্য মর্ত্ত বা মরণ-শীল—নামে পরিচয় দিয়াছিলেন।

ব্রাত-নামের মূল সঞ্চয়শীলতা। ব্রাত-নাম-ধারণের পূর্ব্বে আর্য্যগণ শস্যোৎপাদন আরম্ভ করিয়া শস্য-সংরক্ষণের সুব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল পরে যখন শস্যাগার প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল, তখন তাঁহারা "ব্রাত" বা শস্য-সঞ্চয়কারী নামে পরিচয় দিলেন। এ সময়ও তাঁহারা যাযাবর ছিলেন।

অতঃপর আর্য্যসমাজের পরিপুষ্টির সূচনা হয়। এই সময় হইতে তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, আয়ু, যদু, অনু ও পুরু নামে পরিচিত

মনুষ্যগণ ক্রমে আর্য্যসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হন। তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু প্রভৃতি নামগুলির রহস্য আলোচনা করিলে, এই শব্দগুলির মনুষ্যবাচক-রূপে নিরুক্তশাস্ত্রে উল্লিখিত হওয়ার কারণ চিন্তা করিলে, ইহার রহস্য বুঝা যাইতে পারে। পুরাণের বর্ণনায় পাওয়া যায়, নহুষ এক রাজার নাম। তাঁহার পুত্রের নাম যযাতি। যযাতির পুত্র পুরু, অনু, যদু, দ্রুহ্যু, আয়ু, তুর্ব্বসু। যযাতির জরা গ্রহণ করিয়া স্বীয় যৌবন যযাতিকে দান করিতে কেবল পুত্র পুরুই সম্মত হন এবং পুরুই পিতা যযাতির অনুগ্রহ লাভ করেন। যদু প্রভৃতি পুত্রগণ পিতা যযাতি কর্ত্তৃক নিগৃহীত হন। যদুবংশের রাজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয়। তুর্ব্বসু প্রভৃতি তাড়িত হন। তুর্ব্বসুর সন্তানগণ যবননামে পরিচিত হয়। এই পৌরাণিক উপাখ্যানে আমরা নহুষ প্রভৃতি পাইতেছি। মনুষ্যবাচী নহুষ-শব্দে মনুষ্যই বুঝায়। যদু, তুর্ব্বসু প্রভৃতি যাহারা নহুষের পৌত্ররূপে বর্ণিত, তাহাদের নামগুলিও মনুষ্যবাচক। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, যখন আর্য্যগণ 'নহুষ' নামে পরিচিত ছিলেন, সেই সময়ে যদু, তুর্ব্বসু প্রভৃতি নামধারী নানাস্থানের ভিন্ন সম্প্রদায়েরা আর্য্যসমাজে মিশিয়া যান। পরে দীর্ঘকালে নহুষ প্রভৃতি 'রাজা' রূপে কল্পিত হন ও যদু প্রভৃতি তাঁহার বংশধর বলিয়া উল্লিখিত হন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে, তুর্ব্বসুর বংশধরগণ সকলে আর্য্যসমাজে স্থান পান না। একদল বিরোধ করিয়া আর্য্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্রই থাকিয়া যান, তাঁহারা 'যবন' নামে পরিচিত হন ; আর যাঁহারা আর্য্যসমাজে গৃহীত হন, তাঁহারা

'যবন' নাম ত্যাগ করিয়া আর্য্য নহুষের প্রপৌত্র হইয়া দাঁড়ান।

তুর্ব্বসু নিরুক্তের "তুর্ব্বশ" সন্দেহ নাই। তুর্ব্বশগণ যে প্রাণিহিংসক তুরাণীয় সম্প্রদায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনেকের মতে দ্রুহ্যুরা পরোপকারী লুণ্ঠনব্রত দ্রাবিড়ীয় জাতিবিশেষ। 'অনু'গণ সম্ভবতঃ হূনজাতি। অনু শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তিকালে কল্পিত। প্রথমতঃ হূণগণ অত্যাচারী ও পরস্ব দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা "প্রাণধারণ করেন" মাত্র, পরের প্রাণদান করেন না, এইভাবে প্রাণনবান্ বা 'অনু' নামে পরিচিত। যদুগণ যে নিতান্ত দুর্দ্দান্ত অপরাধকারী সম্প্রদায়, তাহা অনুমান করা যায়। কারণ রাজা কর্ত্তৃক তাঁহারা নিয়মিত বা শাসিত হইতেন, এ কথাই যদু-শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনে বলা হইয়াছে। পুরুসম্প্রদায় পারসীকজাতি কিনা তাহা বুঝা কঠিন। তবে উঁহারা যে অপরের নিকট হইতে কাম্যবস্তুসংগ্রহকারী বৈদেশিক মানবসম্প্রদায় হইতে আর্য্য-সমাজে গৃহীত, তাহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে। আয়ু গতিশীল জাতিবিশেষ। ইহাদের সহিত আর্য্যগণের যাযাবর অবস্থায় মিলন হয়, পরে সমন্বয় সাধিত হয়।

আর্য্যগণ যতদিন যাযাবর ছিলেন, ততদিন তাঁহারা জগৎ বা গতিশীলসম্প্রদায় ছিলেন, পরে ক্রমে একস্থানে গৃহ গোত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া যখন তাঁহারা স্থায়ী অধিবাসী হইলেন, তখন তাঁহারা 'তস্থুষ' বা স্থিতিশীল নাম ধারণ করিলেন। ক্রমে গ্রাম-

নগরাদির প্রতিষ্ঠা ও সমাজের ব্যবস্থা হইল। পরে কর্ম্মবিভাগের সামঞ্জস্যরক্ষার্থ চতুর্ব্বর্ণবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণই আর্য্যসমাজ—এরূপ স্থিরীকৃত হইল। ইহার পর অনার্য্য পাপকারী নিষাদজাতি আর্য্যসমাজে স্থানলাভ করে। এই সময় 'পঞ্চজন' নামে আর্য্যগণ পরিচয় দিতে প্রস্তুত হন। আর্য্যসমাজের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ এবং পঞ্চম নিষাদ এই পঞ্চজন লইয়াই তখনকার আর্য্যসমাজ। ক্রমে নিষাদগণ আর্য্যসমাজে সমাদৃত হইয়া উন্নতি লাভ করিল—যজ্ঞাধিকার পাইল। তখন মীমাংসকগণ বলিলেন 'নিষাদো রৌদ্রযাগকৃৎ'। নিষাদরাজ গুহ আর্য্যরাজা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন করিবার ও সমাসনে উপবেশনের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রথম (বর্ণভেদের যুগে) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যজ্ঞাধিকার ছিল। শূদ্রগণের তখনও যজ্ঞাধিকার জন্মে নাই। ক্রমে আর্য্যসমাজের উন্নত ও শিক্ষিতগণের সহিত সম্মিলনের ফলে শূদ্রগণের উচ্চ অধিকারের যোগ্যতা জন্মিল। তখন 'অযুজ্বন্' বা অযাজ্ঞিক শূদ্র যজ্ঞাধিকার পাইল। নিরুক্তভাষ্যে দেখা যায় "শূদ্রস্যাপি ওদনসবে" 'আয়ুরসীতি শূদ্রায় প্রযচ্ছতি তস্তে প্রযচ্ছামীতি শূদ্রঃ প্রতিগৃহ্লাতি' ইত্যাদিনা, তথা 'দাসী পিনষ্টি পত্নী বা' ইত্যনেনচ দাস্যাদের্ব্যাপারাদপ্যেবং যজ্ঞসম্পাদিত্বমেকীয় মতেন।" অর্থাৎ শূদ্রেরও ওদনসবযজ্ঞে অধিকার আছে। "শূদ্র যজমানকে 'তুমি আয়ু' এই মন্ত্রে অর্পণ করিবে, 'তাহা

আপনাকে প্রদান করিতেছি' বলিয়া যজমান (শূদ্র) গ্রহণ করিবে" এই যজ্ঞ-সংক্রান্ত বাক্য হইতে এবং 'দাসী পেষণ করিবে অথবা যজমানপত্নী পেষণ করিবে" এই ব্যবস্থা-বাক্য হইতে শূদ্রের এবং শূদ্রাদাসীর যজ্ঞ সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়।

মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণের "শূদ্রাণামনিরবসিতানাং" সূত্রের আলোচনায় মহর্ষি পতঞ্জলি "অনিরবসিত" শূদ্রের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন যে, যে সকল শূদ্র আর্য্যগণের ভোজনপাত্র হইতে বহিষ্কৃত নহে এবং যাহারা যজ্ঞকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত নহে, তাহারা 'অনিরবসিত শূদ্র'। এখানে দেখা গেল, যোগ্যতা অনুসারে শূদ্রগণ ত্রৈবর্ণিক আর্য্যগণের ভোজন-পাত্রে ভোজন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল এবং অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া পরে যজ্ঞাধিকারী হইয়াছিল। শূদ্র সম্বন্ধে এই সময়ে শাস্ত্রে লেখা হয়—"নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।" নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিবে, পরিত্যাগ করিবে না। শাস্ত্রে 'পঞ্চযজ্ঞ-রত' শূদ্রের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

এতাবৎ আলোচনায় আমরা বুঝিলাম, আর্য্যসমাজ বৈদেশিক তুরাণীয় দ্রাবিড়ীয় হূণ শক প্রভৃতি জাতিকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে। শূদ্রগণকে যোগ্যতা অনুসারে উচ্চাধিকার দিয়া সমাজে সাম্য স্থাপন করিয়াছে। নিষাদ প্রভৃতি অনার্য্যজাতিকে আর্য্য করিয়া যজ্ঞাধিকার প্রদান করিয়াছে। কাহাকেও বিনষ্ট করে নাই। স্বার্থ সংঘর্ষণস্থলে স্বার্থের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করিয়া লইবার শক্তি আর্য্যসমাজের ছিল, কাজেই

আর্য্যসমাজ তাৎকালিক সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের পথেই বর্ত্তমান সমস্যারও সুমীমাংসা হইতে পারে। ভারতীয় মনীষিগণ সমস্যার সমাধানকল্পে এই সমন্বয়-নীতিরই আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন—ইহাই আমরা অদ্যকার আলোচনায় অবগত হইলাম।

(পঞ্চম প্রবন্ধ)

সমন্বয়নীতি দ্বারা সমস্যার মীমাংসা করা যায়, ইহা পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যেও চিন্তনীয় আছে। কেবল সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টায় বা রাজশক্তির ইঙ্গিতেই সর্ব্ববিধ সমুন্নয়ন-ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে না—মাত্র উক্ত উপায়দ্বয়ের সাহায্যেই সমন্বয়নীতি সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সমন্বয়প্রথার সাহায্যে সমুন্নতিসাধনে যত্নবান্ নেতৃবর্গ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আত্মপ্রত্যয়হীন লোকের উন্নতি সাধন করিতে পারেন না। যাহার হৃদয়ে উত্থানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহার হৃদয়ক্ষেত্রে উচ্চাশার উজ্জ্বলবর্ত্তিকা ক্ষণকালের জন্যও আত্মপ্রকাশ করে না, তাহার উন্নয়নসাধনে যত্ন করিয়া কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যাঁহারা উন্নতিসাধনের অগ্রদূত-স্বরূপ হইয়া অপরের উন্নয়নে মনোনিবেশ করিবেন, তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এই যে;

সাধারণকে মানুষের ন্যায্য অধিকার বুঝাইয়া দেওয়া। মনুষ্যের ন্যায্য অধিকার বুঝিতে পারিলে, মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়া উঠে, দীনতা হীনতা ও ক্ষীণতার অন্ধকার দূরে পলায়ন করে,—আত্মপ্রত্যয়ের বিমল উজ্জ্বল আলোকে তাহার হৃদয়তল আলোকিত ও পুলকিত হয়। যোগী যেমন নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগাইয়া, ব্রহ্মমার্গে লইয়া গিয়া, ব্যক্তির মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন, তদ্রূপ সুপ্ত জাতিকে জাগাইতে হইলে, তাহার শক্তিকে জাগরিত করা চাই এবং ব্রহ্মমার্গে লইয়া যাওয়া চাই। যতকাল পর্য্যন্ত মহাশক্তির মূর্চ্ছাভঙ্গ না হয়, ব্রহ্মস্বরূপের উদ্বোধ না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার মুক্তিমার্গের অর্গল অপসারিত হয় না। শক্তির জাগরণ ভিন্ন সমস্তই ব্যর্থ।

মহামতি মণ্টেগু ভারতে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠার জন্য আসিলেন,—ভারতের জন্য বরাভয় লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ভারতবাসীর আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পায় নাই, ভারতের কুলকুণ্ডলিনী জাগে নাই, কাজেই ভারত সমস্বরে বলিতে পারিল না যে "আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই।" কেহ কেহ বলিল 'স্বরাজ চাই', আবার কেহ বা বলিল "না না, আমরা উহা চাই না, আমরা এখনও উহার উপযুক্ত হইতে পারি নাই।" উঠিবার জন্য প্রাণের টান্ না হইলে কি উঠা যায়? প্রদাতার হস্ত অবস্থা বুঝিয়া সঙ্কুচিত হইল।

রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন অধিকার-লাভের তীব্র আগ্রহ না জাগিলে অধিকারলাভ দুর্লভ হয়, সামাজিকক্ষেত্রেও সেইরূপ।

কবষ নামে প্রাচীনকালে এক ঋষি ছিলেন। তিনি চণ্ডাল হইয়াও ঋষিত্ব-পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও সমাজে যেরূপ হয়, ব্রাহ্মণ-বংশজ খৃষ্টান্ অন্যবংশজ খৃষ্টানকে একটু নীচ জ্ঞানে তাহার সহিত যেন সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন, তদ্রূপ মহর্ষিগণ কবষকে একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে অধিকার প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। তৎকালে ঋষিরা সরস্বতী-তীরে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবষ সেই যজ্ঞে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের যজ্ঞের উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা অথবা সদস্য প্রভৃতি যে কোন পদে অভিষিক্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কবষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না—কবষ গুণগরিমা-সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যাত হইলেন। বিষণ্নচিত্তে কবষ অদূরে পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন, ফলে সরস্বতী, ঋষিদিগের যজ্ঞস্থান পরিত্যাগ করিয়া কবষের স্থান দিয়া প্রবাহিত হইলেন। তখন ঋষিরা বুঝিলেন,—কবষের দাবী ন্যায্য এবং তাহা সমর্থন না করিলে উপায়ান্তর নাই, তাহাই তাঁহার দাবী মঞ্জুর করিলেন। দাবী করিবার জন্য ভিতরে শক্তি চাই।

যখন পঞ্চনদপ্রদেশ মুসলমানের দ্বারা প্রপীড়িত, তখন তদ্দেশে গুরুগোবিন্দ সিংহ নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দ সিংহ দেখিলেন যে, হিন্দুদিগের মধ্যে যোদ্ধা একমাত্র ক্ষত্রিয়, অন্য তিন বর্ণ অস্ত্রধারণ করেন না, অথচ বিপক্ষেরা সকলেই অস্ত্রধারণ করেন। এই জন্য তিনি সমগ্র হিন্দুজাতিকে

অস্ত্রধারণ শিক্ষা দিয়া সকলকেই “ক্ষত্রিয়” করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধারে ব্রতী হইলেন। সকলেই ক্ষত্রিয়—এইজন্য সকলের নামই ‘সিংহ’ থাকিবে; সকলেই একগুরুর সন্তান, সেইজন্য সকলেই “ভাই ভাই।” শিখদিগের নাম যথা, ভাই চাঁদ সিংহ, ভাই গুরুমুখ সিংহ ইত্যাদি। তরবারির দ্বারা আলোড়িত ভাং চিনি ও জলমিশ্রিত সরবৎই এই ক্ষত্রিয়গণের অভিষেকের গঙ্গা· জল। গুরুগোবিন্দ সিংহ আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকেই আহ্বান করিলেন “এস নবধর্ম্ম গ্রহণ কর।” ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই শিষ্য বা শিখ এবং সিংহ বা ক্ষত্রিয় হইল। সম্মুখে এক মলগ্রাহী মেথর (পাঞ্জাবে যাহাকে ভাঙ্গী বলে) ছিল, গুরুগোবিন্দ তাহাকে বলিলেন, “আও বাবা, তোম্‌ভি আয় যাও” (এস তুমিও এস।) গুরুগোবিন্দের ইচ্ছা, পতিত মেথরকেও অন্যান্য জাতির সহিত সমান করিয়া দেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষমাত্রই মেথরের ছিল না; ভিতরে ও বাহিরে সে মেথর ছিল। সে বলিল “গরীবন্তু, কেইছ্যা যায়েগে” গুরুগোবিন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন “বাবা, আয়্‌ যাও, মেরে গোদ্‌মে বৈঠ যাও” (এস আমার অঙ্কে উপবেশন কর,) কিন্তু মেথর পুনর্ব্বার “আমি অতি নীচ, আমি কিরূপে যাইব” এইরূপ উত্তর করিল। এইরূপ তিন আহ্বানে যখন মেথর আসিল না, তখন গুরুগোবিন্দ বাধ্য হইয়া বলিলেন “ম্যায় কেয়া করেঙ্গা, তোম্‌ যাইছা হও ঐছাই রহ।” (আমি কি করিব, তুমি যেমন আছ সেইরূপ থাক।) পঞ্জাবে অদ্যাবধি এক মেথর মাত্র অনাচরণীয়, তাহার জল কেহ

স্পর্শ করে না। সুতরাং উঠিবার জন্য ভিতরে শক্তি না থাকিলে উঠিবার একান্ত চেষ্টা হয় না।

আমাদের বর্ত্তমান-সমাজে অনেক জাতির উন্নত হইবার ইচ্ছা দেখা যায় বটে, কিন্তু উচ্চ হইবার ইচ্ছার সহিত অন্যান্য জাতিকে নীচে রাখিয়া তাঁহারা উচ্চে উঠিবেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র আছে। পূর্ব্বে "চণ্ডাল" বলিয়া ইহাদিগকে Censusএ লেখা হইত। ইহা তাহারা অত্যন্ত গ্লানিকর মনে করিল। ১৮৯১ সালে Censusএ গবর্ণমেণ্ট ইহাদের "নমঃশূদ্র" বলিয়া লিখিবার আদেশ প্রচার করেন।

গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে এই দীন লেখকের কিছু সংশ্রব ছিল। নমঃশূদ্র জাতির নেতা-দিগের অনুরোধে আমি যাহা কিছু পারি করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে নমঃশূদ্রজাতি ধনে ও বংশে ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জল, উচ্চবর্ণে গ্রহণ করেন না—এই তাহাদের আক্ষেপ, এবং তজ্জন্য উচ্চবর্ণস্থব্যক্তিদিগের সহিত তাহারা বিবাদে লিপ্ত হইয়াছে। এক যশোহর-জেলায় তাহাদের সংখ্যা দেড়লক্ষ। তাহারা অন্যজাতির কোন কার্য্য করিতে এক্ষণ সম্মত নহে তাহারা এক সময় লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, জয়পুর, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের উচ্চসমাজস্থ লোকদিগের নিকট তাহাদের জল-চলনের প্রার্থনা করে। একটী সভা আহুত হয়, এবং আমি কোন কার্য্যবশতঃ আমার পল্লীস্থ লোহাগড়ার বাড়ীতে থাকায়

অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ সভায় উপস্থিত হই। নমঃশূদ্রদিগের আবেদন, যাহাতে তাহাদের জল চলে। কিন্তু হিন্দুসমাজে অনেক উন্নতি-সত্ত্বেও সুবর্ণবণিক্ ও সাহাদিগের জল এখনও চলে নাই, ভাবিয়া, সভার নেতৃগণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, আবেদনের সুমীমাংসার জন্য অধীনের উপর ভারার্পণ করেন। আমি বলিলাম, "নমঃশূদ্র, মুচি, ম্যাথর প্রভৃতি যে সমস্ত জল অনাচরণীয় জাতি এখানে উপস্থিত আছ, সকলেই এক এক গ্লাস জল লইয়া আইস; অদ্য হিন্দুসমাজ হইতে জল-অনাচরণের প্রথা উঠাইয়া দেই।" আমার কথা শুনিয়া নমঃশূদ্রেরা বলিল, "আমরা মুচি ম্যাথরের জল খাইব না।" আমি বলিলাম, "তোমাদের জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি পান করিবেন, আর তোমরা তোমাদের নিম্নবর্ণের জল গ্রহণ করিবে না, ইহা হইতে পারে না।" নমঃ-শূদ্রদের দাবী যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া গ্রাহ্য হইল না এবং তাহাদের কিছু বলিবারও রহিল না।

সকল জাতিকেই আমি বলি,—কেবল নিজে উঠিলে চলিবে না, সকলকেই উঠাইতে হইবে। যিনি যে অধিকার চান, তাহার জন্য তাঁহার উপযুক্ততা চাই। নামে সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে চান, কিন্তু কার্য্যে সকলেই শূদ্রবৎ থাকিতে চান। ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণত্ব না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নাম সত্ত্বেও তিনি অব্রাহ্মণ,—"বচনশতেনাপি বস্তুনোঽন্যথাকরণাশক্তেঃ" অর্থাৎ শত বচনের দ্বারা বস্তুর অন্যথা হয় না। যেমন গোলাপ-ফুলকে "ঘেটু ফুল" নাম দিলেও তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হইবে না,

তেমনি ঘেটু ফুলকে "গোলাপ" নাম দিলেও তাহার দুর্গন্ধ দূর হইবে না, সুতরাং যে জাতি যে অধিকার প্রাপ্ত হইতে চাহেন, তাহাতে তাঁহাদের উপযোগিতা চাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি এই নিদ্রিত আত্ম-প্রত্যয়হীন সমাজকে—জাতিকে জাগাইবার জন্য চেষ্টা করা ব্যর্থশ্রম ? প্রত্যুত্তরে বলিব "না, তাহা নহে ; চেষ্টা করা চাই।" অনেক সময় হিতার্থী স্বজন প্রার্থনা না করিলেও প্রদান করেন। দেখা যায়, রোগের প্রবল আক্রমণে বিভ্রান্তচিত্ত রোগী যখন ঔষধগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, আপত্তি করে, তখনও তাহার মঙ্গলার্থী চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ-প্রদানে কার্পণ্য প্রকাশ করেন না, বরঞ্চ অধিকতর আগ্রহসহকারে ঔষধ-প্রয়োগ করিতে থাকেন। সুতরাং উচ্চাশাবিহীন পতিত সমাজের জনসাধারণের মঙ্গলার্থী নেতাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সকলের কর্ণে অধিকারের মুক্তিমন্ত্র প্রদান করিয়া, তাহাদের সুপ্তশক্তির উদ্বোধন-সাধন করিতে প্রচুর প্রযত্ন প্রকাশ করিবেন। সাধারণ-শক্তিসম্পন্ন নেতাদের চেষ্টায় দীর্ঘকালে ইহা সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু অসাধারণ-শক্তির অবতার মহাপুরুষের চেষ্টায় একার্য্য স্বল্প-কালেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাপুরুষের আবির্ভাব কতদূরে, জানি না ; আপাততঃ সাধারণশক্তিশালী বহু প্রচারকের দ্বারা একার্য্যের সূচনা করা যাইতে পারে।

প্রচারকগণ জনসাধারণের হৃদয়ে উচ্চাশার বীজ বপন করিতে পারেন। তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে পারেন, মানুষের ন্যায্য

অধিকারের পরিধি কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মানুষের উচ্চাশার মূল্য কত।

বাস্তব পক্ষে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভ পরস্পর সংসৃষ্ট। ইহার একটীকে করায়ত্ত করিতে পারিলে, অন্যটী আপনা হইতেই হস্তগত হয়। প্রকৃষ্টশিক্ষার ফলে মানবীয় অধিকারজ্ঞান জন্মিলেই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ঘটে। যখন শক্তির প্রবোধ সম্পন্ন হয়, তখন বিশ্বের কোনও ব্যাপারে কেহ তাহার দাবী অস্বীকার করে না। দাবীর মূলে "আমার" জ্ঞান। যাহা 'আমার' বলিয়া ধারণা হয়, তাহাই লোকে দাবী করে। পুত্র পিতৃধন দাবী করে, কারণ তাহার ধারণা হয়—"ইহা আমার"। যেখানে এরূপ ধারণা নাই, সেখানে কেহ দাবী করে না।

মানুষের স্বাভাবিক অধিকার অনুসারে সে তাহার জীবন-যাত্রার সর্ব্ববিধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে। স্নান-পানে, ভোজনে বিচরণে, গৃহাদিনির্ম্মাণে, বেশভূষায়, জীবনধারণে, ধর্ম্ম-যাজনে, আত্মরক্ষণে তাহার যেরূপ স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাযুক্ত অধিকার আছে, সে অধিকার হইতে কেহ তাহাকে ন্যায্যভাবে বিচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সমাজের জাতির মঙ্গলসাধনের ও আত্মরক্ষণোপযোগী আয়োজনের যে সঙ্গত অধিকার তাহাদের আছে, তাহা হইতেও কেহ সমাজ বা জাতির জনসাধারণকে ন্যায়তঃ বঞ্চিত করিতে পারে না। এই অধিকার হইতে বলপূর্ব্বক যখন কেহ বঞ্চিত করিতে চায়, তখন বিরোধ বিসম্বাদ আবির্ভূত হয়—

দ্বন্দের প্রকোপ প্রকাশ পায়। মানবের হৃদয়ে যদি অধিকার-বোধ যথার্থ জাগরিত হয়, তবে ঐ বিরোধে বা দ্বন্দে তাহার ন্যায্য দাবীই জয়যুক্ত হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ফ্রান্সে যখন সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় গোলযোগ বা অধিকারের অবমাননা উপস্থিত হয়, তখন সেই আঘাতে জনসাধারণের শক্তি জাগিয়া উঠে, অধিকারবোধ বিস্তার লাভ করে, তখন সমন্বয়নীতির দ্বারা অধিকারঘটিত সাম্য সংস্থাপিত হয়, ফলে সকল গোল মিটিয়া যায়।

যখন নিম্নশ্রেণীর জনগণ জাগরিত হইয়া অধিকার প্রসার প্রার্থনা করিল, উচ্চশ্রেণী বা অভিজাতগণ একান্ত অনিচ্ছায় অশান্তির আশঙ্কায় তাহাদিগের অধিকারক্ষেত্রের বিস্তার সাধনে সম্মত হইলেন। অনভ্যস্ত অধিকার দাবী করায় তাঁহাদের প্রাণে ক্ষোভের উদয় হইল—তাঁহারা মনে করিলেন, "ইহা আমাদের পরাজয়," কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যাঁহারা চিন্তা করিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, "আপাতদৃষ্টিতে ইহা "পরাজয়" মনে হইলেও যথার্থতঃ ইহা "জয়ই"ই বটে।" সঙ্কীর্ণ আদর্শ লইয়া বিচার করিলে, ইহা পরাজয় বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসরণে কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে গেলে ইহাকে 'জয়' বলিয়াই মনে হইবে।

অধিকার রক্ষার মুলে দায়িত্ববোধ। দায়িত্বজ্ঞান ব্যতীত অধিকার রক্ষা করা যায় না। যাহার অধিকারক্ষেত্র যত বিস্তৃত,

তাহার দায়িত্বও তত অধিক। সুতরাং অধিকারলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্বজ্ঞানের প্রসার-সম্পাদন প্রয়োজন হয়। দায়িত্ব-জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির উপর বিপুল অধিকার ন্যস্ত হইলে, তাহা পরিণামে যে কত ভয়াবহ ও কুফলপ্রদ হয়, জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

অধিকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরের যেমন আমার প্রতি কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব বৃদ্ধি হয়, আমারও তেমন অধিকার-বৃদ্ধি হইলে অপরের প্রতি কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব বর্দ্ধিত হয়, একথা না বুঝিলেই চলে না। অজ্ঞ যেমন দেশের নিকট বিজ্ঞের নিকট জ্ঞানলাভের জন্য দাবী করিতে পারে, বিজ্ঞও তেমনি অজ্ঞের উপর দায়িত্ববোধ-যুক্ত আনুগত্যের দাবী করিতে পারেন। বিজ্ঞের যেমন দেশের অজ্ঞগণের জন্য দায়িত্ব আছে, অজ্ঞেরও তেমনি দেশের নিকট—বিজ্ঞের নিকট প্রচুর পরিমাণে দায়িত্ব আছে। অজ্ঞ বিজ্ঞ, ধনী নির্ধন, উন্নত অবনত সকলেই স্ব স্ব অধিকার অনুসারে কর্ত্তব্যের—দায়িত্বের নাগপাশে বদ্ধ। এই ন্যায়নীতির বন্ধন যে অতিক্রম করিতে চায়, সে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি কখনই কল্যাণলাভ করিতে পারে না।

দায়িত্ববোধ লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। সমাজের সকলে যাহাতে স্বীয় স্বীয় আবেষ্টনের মধ্যে পালিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়া এক মহাসাম্যের সমতলে উপনীত হইতে পারে, সেইভাবে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। উন্নতকে নামাইতে চাহি না, অবনতকে উন্নত করিয়া সাম্যস্থাপন করিতে চাহি। অধিকারবোধ ও দায়িত্ব-

জ্ঞান জাগাইয়া দিয়া, জনসাধারণ যাহাতে আপনাদের দায়িত্বপূর্ণ সংযত অধিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তাহারই আয়োজন-সাধন সমস্যার সমাধানকল্পে বরণীয় করণীয় ও প্রভূত প্রয়োজনীয়।

সমন্বয়নীতি অবলম্বনে সর্ব্বসম্প্রদায়ের স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উন্নয়ন প্রণালীর সাহায্যে সমস্যার মীমাংসা করা যায় সত্য, কিন্তু হিন্দুসমাজ বর্ত্তমানে যেরূপ জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কে কাহার উন্নয়নে মনোযোগী হইবে, কে বা উন্নত হইবে? এ সমাজের নেতৃগণেরও যেমন জড়ভাব উপস্থিত হইয়াছে, জনসাধারণেরও তদ্রূপ জড়তা ঘটিয়াছে। মূল কথা এই যে দীর্ঘকাল পরায়ত্ত শাসনের ফলে এ দেশের জনসমাজ নির্জ্জীব দেহের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পরায়ত্ততার মধ্যে থাকিয়া এই নিশ্চেষ্টতার অপনোদন সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও অনেকাংশে কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই, আপাততঃ পরায়ত্ত-শাসনে বাধ্য থাকিয়া এই ভাবের দূরীকরণ অসম্ভবই বোধ হয়। সজীবতার লক্ষণ কার্য্যকারিতা এক দিক্ দিয়া প্রকাশ পায় না। সামাজিক সজীবতা ও রাজনৈতিক সজীবতার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। যাহাদের রাজনৈতিক অধিকার নাই, তাহাদের সামাজিক অধিকারও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পরস্পরাপেক্ষ। সুতরাং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিলে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক জাগরণের উন্মেষ উপস্থিত হইবে। ইংরেজেরা বলেন "বর্ত্তমানে ভারতীয়

জনসাধারণকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিলে উচ্চশ্রেণীর জনগণ তাহার অপব্যবহার করিবে, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ নিম্নশ্রেণীর জনগণ সুবিধায় বঞ্চিত হইবে।" কিন্তু বিবেচনা করিলে মনে হয়, এরূপ কথার মূল্য নাই। নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে যদি নিম্নশ্রেণীর কোনও লোক কাউন্সিলে স্থান লাভ করে, তাহাকে কে নাবাইতে পারিবে? পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অধিকার লাভের ফলে তাহার স্বজাতীয়গণের মধ্যে জাতীয় উন্মেষণা উপস্থিত হইবে। ফলতঃ সকলের সম্মুখেই এক মহালক্ষ্য স্থাপন করা দরকার। যেমন সকলের সামাজিক অধিকারের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ব্রাহ্মণত্ব, তেমনি রাজনৈতিক অধিকারের উচ্চপদবীও যাহাতে জনসাধারণের মহালক্ষ্য হইতে পারে অর্থাৎ উহা আয়ত্ত করিবার অধিকার সাধারণের থাকিতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা চাই। নচেৎ সামাজিক অধিকারলাভ সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ অনুদার এবং তাঁহাদের হস্তে অধিকারের অপব্যবহার হইত, এখনও কাহারও কাহারও আশঙ্কা আছে, এরূপ যাঁহারা বলেন, তাহারা সত্যের সহিত পরিচিত নহেন। যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের এইরূপ মনে করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ব্রাহ্মণেরা অপর বর্ণকে ছোট করিয়া রাখিতেন, তাহাদের অধিকার প্রদান করিতেন না এ কথা সত্য নহে। শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা উদারতার শত্রু ছিলেন না। সকল সময়েই সমাজে উদার মতাবলম্বী ও সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী লোক থাকে, কিন্তু তাহাতে কোনও জাতি বা

সম্প্রদায়বিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। সকল সময়ে সকল সম্প্রদায়েই উদারনীতির জয় হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আমরা হিন্দুসমাজের সমস্যার প্রথম খণ্ডের উপসংহারকল্পে রামায়ণের দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতে চাই। সকলেই জানেন, আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র তপস্যানিরত শূদ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজন পরিচিত সেই উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত ভাবে এই—রামরাজ্যে এক ব্রাহ্মণতনয়ের অকাল মৃত্যু হইল, ঋষিরা স্থির করিলেন এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে, তাহার ফলে অধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণতনয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে এ সংবাদ জানান হইল এবং শূদ্র তপস্বীর প্রাণসংহার করিয়া ব্রাহ্মণতনয়ের পুনর্জ্জীবন প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বলা হইল। শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তপোনিরত শূদ্রের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন্ জাতীয়? তপস্বী শূদ্র উত্তর দিল শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ। এই কথা শুনিয়া—আদর্শ নৃপতি শ্রীরামচন্দ্র খড়গাঘাতে শম্বুকের প্রাণসংহার করিলেন। ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়গং সুরুচিরপ্রভং নিষ্কৃষ্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ। উত্তর কাণ্ড, একোননবতিসর্গ, ৪ শ্লোক। উত্তরচরিতে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন রে হস্ত দক্ষিণ মৃতস্যশিশো-র্দ্বিজস্য জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমনৌ কৃপাণম্ রামস্য পাত্রমসি দুর্ব্বহগর্ভখিন্নসীতাবিবাসনপটোঃ করুণা কৃতস্তে—অর্থাৎ হে দক্ষিণ হস্ত শূদ্র মুনির দেহে কৃপাণ স্থাপন কর যে হস্তে সীতাকে বনবাস

দিয়াছ, তাহার আবার করুণা কোথায় ? এই ঘটনাকে অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা হয়, বস্তুতঃ ইহা সঙ্কীর্ণতার কথাই বটে, সেই আদর্শ রাজ্যেও তৎকালে অনুদার মতাবলম্বী জনগণের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। আবার পরবর্ত্তী কালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহাকবি ভবভূতি শম্বুকবধকে সীতানির্ব্বাসনের ন্যায় গুরুতর কুকর্ম্ম বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যাহারা এই সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখেন, তাঁহাদের রামায়ণের অপর একটী ঘটনারও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করেন, ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত। এই অন্ধমুনি ও তাঁহার পত্নী তপস্বিনী ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু ইহাদের বর্ণ-পরিচয়ের সংবাদ সকলে রাখেন কি ? যখন ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া রাজা দশরথ ব্যথিত হইলেন তখন বাণবিদ্ধ মুনিপুত্র তাহাকে বলিলেন—"ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদয়াদপনীয়তাং। ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মাভূৎতে মনসোব্যথা। শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ! অর্থাৎ হে রাজন্, আপনার ব্রহ্মহত্যা পাপ ঘটে নাই, আমি তপস্বী কিন্তু দ্বিজাতি নহি, শূদ্রা আমার মাতা, বৈশ্য আমার পিতা। এই যে শূদ্রাপুত্র তপস্যা করিতেছিল এ মুনি তপস্বী, ইহার মাতাও তপস্বিনী, তাঁহার শাপভয়ে রাজা দশরথ ভীত! এ শূদ্রাপুত্রের তপস্যার কথা ত রামায়ণেই বর্ণিত আছে। এখানে কি উদারতার দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ মনে হয় ? সকলেই শম্বুকের কথা বলে, একথা কেহ বলেন না।

এই জন্যই বলিতে হয়, সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা জাতি বা

সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহে। উচ্চশ্রেণীর হস্তে অধিকারের অপব্যবহারের আশঙ্কা নাই। রাজনৈতিক অধিকার করায়ত্ত হইলে সামাজিক অধিকারও সাফল্য লাভ করে, অন্যথা নহে, ইহাতে সংশয় নাই।

হিন্দুসমাজের সমস্যার সমাধানে অনেক কথা বলিবার থাকিল, সে সকল কথা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব।

সমাপ্ত।